ইউনিট
২

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ

তাওহীদ ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মূলভিত্তি। ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করার জন্য এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালিত করার জন্য তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। রুবুবিয়াত বা বিশ্বসৃষ্টি পরিচালনায়, ইবাদাত ও দাসত্বে এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক হিসেবে স্বীকার করা অপরিহার্য। রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত ও গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা যাবে না। কেউ আল্লাহকে একক উপাস্য ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস না করলে সে মুমিন হতে পারে না। তাওহীদ ইসলামের প্রবেশদ্বার এবং পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণের সময় একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। তাওহীদে অবিশ্বাসী অভিশপ্ত এবং চির জাহান্নামী। তাওহীদ মুসলিম জাতির প্রাণশক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত। জীবনে-মরণে, সুদিনে-দুর্দিনে, একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরতাই তাওহীদের মূলকথা।

তাওহীদে বিশ্বাসী মুমিন দ্বিত্ববাদ, বণ্ডত্ববাদ, নাস্তিক্যতাবাদ ও পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন থাকে। তাওহীদে বিশ্বাস মুমিন জীবনে অফুরন্ত প্রেরণা এবং আত্মার পরম তৃপ্তি বয়ে আনে। মোটকথা, গোটা ইসলামি ব্যবস্থাপনাই তাওহীদের ধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানব জীবনকে সত্য, সুন্দর ও সুশৃংখল করতে তাওহীদের শিক্ষা অনস্বীকার্য।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : তাওহীদ-এর পরিচয়
❖ পাঠ-২ : তাওহীদ-এর প্রকারভেদ
❖ পাঠ-৩ : আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ
❖ পাঠ-৪ : ঈমান ও ইসলাম
❖ পাঠ-৫ : শিরক
❖ পাঠ-৬ : কুফর
❖ পাঠ-৭ : নিফাক
❖ পাঠ-৮ : বিদ্আত

পাঠ-১

তাওহীদ-এর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- তাওহীদ-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইসলামি আকীদায় তাওহীদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- তাওহীদের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবেন।

তাওহীদ-এর পরিচয়

তাওহীদ অর্থ আল্লাহ তা'আলা এক এবং একক, তাঁর ক্ষমতায় এবং কর্মে কোন অংশীদার নেই। তিনি সত্তাগতভাবে একক এবং গুণগতভাবেও একক, যার সমতুল্য কেউ নেই। আর তিনি উপাসনার দিক থেকেও একক এবং ইবাদত ও দাসত্বের ক্ষেত্রেও একক।

তাওহীদ আরবি শব্দ। এটা ইসলামি বিশ্বাসের মূলভিত্তি। তাওহীদ-এর আভিধানিক অর্থ: একত্ববাদ বা কাউকে একক বলে স্বীকার করা। আরবি توحيد (তাওহীদ) শব্দটি وحد মূল ঋতু হতে নির্গত। এর অর্থ হল-একক বলে স্বীকার করা, এক বলে মেনে নেওয়া, কোন সত্তাকে এক বা একক বলে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রচলিত অর্থে তাওহীদ শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ।

পারিভাষিক অর্থ

আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য একক সত্তা হিসেবে স্বীকার করা ও বিশ্বাস করাই তাওহীদ। ইসলাম ধর্মকেও তাওহীদ বলা হয়। কেননা, এর ভিত্তি হল, আল্লাহ তা'আলা এক এবং একক তাঁর ক্ষমতায় এবং কর্মে কোন অংশীদার নেই। তিনি সত্তাগতভাবে একক এবং গুণগতভাবেও একক, যার কোন সমতুল্য নেই। আর তিনি উপাসনার দিক থেকেও একক এবং ইবাদাত ও দাসত্বের ক্ষেত্রেও একক। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি মানুষের সকল চিন্তা ও ধারণার ঊর্ধ্বে। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি পরিচালনা করেন। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী এবং সমস্ত জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলের উৎস।

তাওহীদ ইসলামি আকীদার মূলভিত্তি

তাওহীদ হচ্ছে ইসলামি বিশ্বাসের মূলভিত্তি। হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াতের প্রথম কথা, ইসলামের প্রথম মঞ্জিল, যেখান থেকে একজন মুমিন আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত এবং আসমা ওয়াসসিফাত এর উপর এককভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন ব্যক্তি যদি নামায আদায় করে কিন্তু আল্লাহ তা'আলাকে একক উপাস্য, একক প্রতিপালনকারী হিসেবে বিশ্বাস না করে, তাহলে সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। ইসলামের প্রবেশদ্বার হল 'তাওহীদ' আর দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেওয়ারও মূলমন্ত্র হল তাওহীদ। যেমন- হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে বর্ণিত হাদিস:

من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

"যার শেষ কথা হবে 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই' (তাওহীদ), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এ স্বীকারোক্তি একজন মুমিন মুসলিমের জন্য জীবনের প্রথমে যেমন অপরিহার্য, জীবনের শেষ মুহূর্তেও তেমনি অপরিহার্য।

তাওহীদ একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রথম আদেশ এবং শেষ আদেশ। তাওহীদ নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান বিষয়। মানবজীবনের দিশারী হিসেবে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী ও রাসূল এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই তাওহীদের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে মানব সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। সকলেই একটি মাত্র ছোট বাক্য لا اله الا الله (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে সকল নবী-রাসূল তাঁদের জীবনভর এবং নবীকুল শ্রেষ্ঠ

হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর নবী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশটি বছর তাওহীদের শিক্ষা প্রচারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। মক্কার জীবনে নবুওয়াতের তের বছর শুধু তাওহীদ সংক্রান্ত বাণীই প্রচার করেছেন এবং তাওহীদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি বণ্ড বাধা-বিঘ্ন ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। তথাপিও তিনি একাজ থেকে বিরত থাকেননি। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ পাই। যেমন আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"আমি তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম এবং সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।" (সূরা আল-আরাফ : ৫৯)

হযরত হূদ (আ) বলেনঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।" (সূরা আল-আরাফ : ৬৫)

হযরত সালেহ (আ) বলেনঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।" (সূরা আল-আরাফ : ৭৩)

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ আদেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগূত বর্জন করো।" (সূরা আন-নাহল : ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ

"আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদাত করো।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ২৫)

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেনঃ

امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله

"আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।" (বুখারী ও মুসলিম)

সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য আদিষ্ট, তা হল আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। আর এ বিষয়েও একমত যে, প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায়ই এ একত্ববাদে বা তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে।

সুতরাং সত্য কথা হল যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানবান নারী-পুরুষের উপর আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজিব।

সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, 'সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য আদিষ্ট, তা হল আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। আর এ বিষয়েও একমত যে, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়ই এ একত্ববাদের বা তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে। একজন মানুষের জন্য সালাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। সালাত আদায় করার পূর্বেই তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে।

ইসলামের সকল বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে, এ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। ইসলামি শরীআতের যত কর্মকাণ্ড আছে তা হচ্ছে এ তাওহীদেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র।

ইসলামের নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা ও সামাজিক আইন-কানুন এ তাওহীদ থেকেই উৎসারিত। এখানকার প্রতিটি জিনিসেরই উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে আল্লাহর একক সত্তা।

ইসলামের নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা ও সামাজিক আইন-কানুন এ তাওহীদ থেকেই উৎসারিত। এখানকার প্রতিটি জিনিসেরই উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে আল্লাহর একক সত্তা। ফিরিশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, কিয়ামত, আখিরাত, ফরয, ওয়াজিব এক কথায় প্রতিটি জিনিসের ভিত্তিই আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ একটি মাত্র জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে ফিরিশতা, কিয়ামত ও আখিরাতে বিশ্বাস একেবারে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে; নবী-রাসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবাদি আনুগত্য লাভের অনুপযোগী হয়ে পড়ে; ফরয, ওয়াজিব, আনুগত্য ইত্যাদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে; আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থায় কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না।

মোটকথা, তাওহীদ এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যা থেকে অপসৃত হলেই গোটা ইসলামি ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এমনকি ইসলাম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। তাই তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলা হয়। আর তাওহীদের শিক্ষাকে আল-ফিকগুল আকবার বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ বলা হয়।

তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অধিকার যা বান্দার উপর ওয়াজিব। তাওহীদ ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বুনিয়াদ। সকল মূলনীতির মূল এবং আমলের ভিত্তি।

তাওহীদের উপকারিতা

তাওহীদের ইহকালীন ও পরকালীন অনেক উপকারিতা রয়েছে। সংক্ষেপে নিম্নে কয়েকটি উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১. ইহকালীন ও পরকালীন নানা ধরনের বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে তাওহীদ।

২. তাওহীদ বান্দার চির জাহান্নামী হওয়ার পথ রোধ করে, যদি তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ তাওহীদও বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার অন্তর পরিপূর্ণভাবে তাওহীদের অনুসারী হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণভাবে বান্দার জন্যে জাহান্নামের পথ রোধ করে।

৩. তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে।

৪. বান্দার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপনীয় ইবাদাত আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় এবং এর জন্য সে বিনিময় লাভ করে।

৫. তাওহীদ বান্দার জন্য সৎকাজ করার পথকে সুগম করে দেয় এবং অন্যায় কাজ পরিহার করতে সহায়তা দান করে এবং বিপদাপদে সান্ত্বনা যোগায়।

৬. তাওহীদ বান্দার দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট লাঘব করে। বান্দা তাওহীদ ও ঈমানের পূর্ণতা অনুযায়ী দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনাকে উদার চিত্তে এবং প্রশান্ত মনে গ্রহণ করে নেয়। সাথে সাথে আল্লাহর দেওয়া ভাগ্যলিপির দুঃখ-দুর্দশাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।

৭. তাওহীদের বিশেষ উপকারিতা হচ্ছে, তাওহীদ বান্দাকে মাখলুকের দাসত্ব, মাখলুকের সাথে অবৈধ সম্পর্ক, তার প্রতি ভয়, তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা এবং তারই উদ্দেশ্যে কাজ করা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দান করে। এর দ্বারাই বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে ইলাহ বা উপাস্য এবং মাবুদ হিসেবে মেনে নিয়ে প্রকৃত গোলামে পরিণত হয়।

৮. তাওহীদের আরও উপকারিতা হচ্ছে, তাওহীদ বান্দার হৃদয়ে যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার অল্প আমলই অধিক সওয়াবের কারণ হয়। তার কথা ও কাজের সওয়াব সীমা ও সংখ্যার হিসাব ছাড়াই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৯. তাওহীদের উপকারিতা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাওহীদবাদীদের উপর থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের অনিষ্টতা ও অকল্যাণ দূর করে দেন এবং উত্তম ও প্রশান্তিময় জীবন দান করেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তারা শান্তি লাভ করে।

১০. তাওহীদে বিশ্বাসের উপকারিতা এই যে, তাওহীদে বিশ্বাসের ফলে প্রতিটি মানুষ, জীব-জন্তু পশু-

পাখি তার থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহর সকল সৃষ্ট বস্তুকে সে ভালবাসতে শিখে এবং অনর্থক কাউকেও কষ্ট দেয় না।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. তাওহীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-
ক. একত্ববাদ; খ. রুবুবিআত;
গ. আল্লাহকে বিশ্বাস করা; ঘ. কোনটিই কঠিক নয়।

২. ইসলামি বিশ্বাসের মূলভিত্তি কী?
ক. আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বিশ্বাস করা; খ. তাওহীদ;
গ. ইবাদাত করা; ঘ. সালাত আদায় করা।

৩. তাওহীদকে বলা হয়-
ক. ইসলামি আইনের উৎস; খ. ইসলামের বুনিয়াদ;
গ. ইসলামের প্রবেশ দ্বার; ঘ. নবী-রাসূলগণের কর্ম।

৪. নবী-রাসূলগণের প্রথম দায়িত্ব কী?
ক. ইসলামের দাওয়াত দেওয়া; খ. তাওহীদের বাণী প্রচার করা;
গ. নামায আদায় করা; ঘ. জিহাদ করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. 'তাওহীদ ইসলামি আকীদার মূলভিত্তি' বর্ণনা করুন।
৩. 'তাওহীদ নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান বিষয়' বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদ বলতে কী বোঝেন? তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
২. তাওহীদে বিশ্বাসের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-২

তাওহীদ-এর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- তাওহীদ-এর প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- উলুহিয়্যাতের তাওহীদ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

তাওহীদ-এর প্রকারভেদ

তাওহীদ শুধু আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত একটি ধারণাই নয় বরং এটি বাস্তব জীবনের একটি সুস্পষ্ট নিয়ামক। আল্লাহ তা'আলা যেমন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মৃত্যুদাতা, তেমনি তিনি বিধানদাতা, রিযিকদাতা ও মঙ্গলদাতা। তিনিই ইবাদাত এবং উপাসনা পাওয়ার একমাত্র সত্তা। তাঁর সাথে ইবাদাতে কাউকে অংশীদার করা যাবে না।

তাওহীদ শুধু আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত একটি ধারণাই নয় বরং এটি বাস্তব জীবনের একটি সুস্পষ্ট নিয়ামক। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ তা'আলা যেমন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মৃত্যুদাতা, তেমনি তিনি বিধানদাতা, রিযিকদাতা ও মঙ্গলদাতা। তিনিই ইবাদাত এবং উপাসনা পাওয়ার একমাত্র সত্তা, তাঁর সাথে ইবাদতে আর কাউকে অংশীদার করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলার এ সকল গুণাবলী (صفات) পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য। আর সে সূত্রটিই তাওহীদ।

তাওহীদ তিন প্রকার যথা-

১. توحيد الربو بية তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (রুবিয়্যাতের তাওহীদ)

২. توحيد الألو هية তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (উলুহিয়্যাতের তাওহীদ)

৩. توحيد الأسماء والصفات তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত (আল্লাহর নাম ও সিফাতের তাওহীদ)

প্রত্যেক প্রকার তাওহীদের বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হল-

১. توحيد الربوبية তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ-এর পরিচয়

এ বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর রব বা প্রতিপালক এবং বিশ্ব অধিপতি, সকল কিছুর স্রষ্টা ও সকল প্রাণীর রিযিকদাতা। আর তিনিই জীবন ও মৃত্যুদাতা, ভাল মন্দ তিনিই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বিপদ আপদে একমাত্র তিনিই বান্দার আহবানে সাড়া দেন। সমস্ত সৃষ্টি জগত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন এক ও অভিন্ন রব বা প্রতিপালক। তিনি অফুরন্ত নিয়ামতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টিজগতকে প্রতিপালন করছেন। সমস্ত ক্ষমতা তাঁরই জন্য এবং তাঁরই হাতে নিহিত রয়েছে সকল মঙ্গল। তিনি যা ইচ্ছা করেণ তা করতে তিনি সক্ষম। তাঁর সার্বভৌমত্বে কারও কোন অংশীদারীত্ব নেই।

আল-কুরআনে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন গুকুমদান ও আইন-বিধান প্রদানের কর্তৃত্বে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অধিকারের প্রতি এক বিন্দু স্বীকৃতি বা অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ ছাড়া মানুষকে আর কেউ কোন কাজের আদেশ দিতে পারে না এবং মানুষ অপর মানুষের দাসত্ববরণ করতে পারে না।

তাওহীদে রুবুয়িয়্যাহ এককভাবে ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং অবশ্যই রুবুবিয়্যাতের সাথে তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত এবং তাওহীদুল উলুহিয়ার সমাবেশ ঘটাতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে মুশরিকদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারাও এ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস করে তা, সত্ত্বেও তারা মুমিন বা তাওহীদে বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন-

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

"বল, কে তোমাদেরকে রিযিক দান করে আকাশ ও যমীন থেকে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে কে বের করে এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে কে বের করে এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না।" (সূরা ইউনুস : ৩১)।

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন-

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

"যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে তাদের সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সূরা আযযুখরুফ : ৮৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন-

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

"যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে, কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করে মৃত্যুর পর? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সূরা আল-আনকাবুত : ৬৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন-

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوۤءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضِ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

"বরং তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।" (সূরা আন-নামল : ৬২)

মুশরিকরা জানত উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, তা সত্ত্বেও তারা মুসলমান হতে পারেনি। হযরত ইবনে অব্বাস (রাঃ) এবং আতা এবং দাহহাক প্রমুখ বলেন যে, কাফেররা আল্লাহ তা'আলাকে জানত এবং রুবুবিয়্যাত সম্পর্কেও তারা জানত এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাজত্ব সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল। কিন্তু তারা এ সব বিশ্বাসের সাথে সাথে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব করত তাই তারা পরিপূর্ণ তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে মুমিন হতে পারেনি। সুতরাং তাওহীদের সকল শাখায় বিশ্বাস স্থাপন করা মুমিন হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

২. توحيد الا لوهية তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতের তাওহীদ-এর পরিচয়

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতের তাওহীদ হচ্ছে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় দাসত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট করা এবং ইবাদতের ব্যাপারে তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার স্থির না করা। অর্থাৎ ইবাদাত এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহকেই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাতের তথা দাসত্ব ও আনুগত্যের অধিকারী হিসেবে জানা এবং স্বীকার করা এবং যাবতীয় ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর একত্বের প্রমাণ দান করাই এই প্রকার তাওহীদের উদ্দেশ্য। শেষোক্ত তাওহীদের জন্য প্রথমোক্ত উভয় প্রকার তাওহীদই অনিবার্য। এজন্যই প্রথমোক্ত উভয় প্রকার তাওহীদই শেষোক্ত তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উলুহিয়্যাত এমন একটি ব্যাপক গুণের নাম, পরিপূর্ণতা, প্রতিপালন এবং শ্রেষ্ঠত্বের সমস্ত গুণাবলী যার অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের গুণে এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা ও দয়ার গুণেই তিনি ইলাহ এবং মাবুদ বা উপাস্য হওয়ার

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় দাসত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট করা এবং ইবাদতের ব্যাপারে তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার স্থির না করা।

যোগ্য। তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলী এবং প্রতিপালনের একক দাবি হচ্ছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা ইবাদাতের অধিকারী হতে পারে না। মানুষের অধিকার নেই এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে মাবুদ রূপে গণ্য করার। সে যত বড় দাপটের বা ক্ষমতার এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন। সকল বিবেচনায় আল্লাহই পূর্ণত্বের অধিকারী। ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা তিনিই। ফলে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত যেমন যুক্তিবিরোধী, বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী, তেমনি ইসলামি শরীআতেও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তাই সকল মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক যে, তারা যখন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে ইবাদাত করবে, তখন সেটা একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে। তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থির করা যাবে না। কোন জনপ্রিয় রাজা বাদশাহকেও নয়, কোন প্রেরিত নবী-রাসূলকেও নয়, কোন অলি-আউলিয়াকেও নয়, যদিও অন্যদের তুলনায় তারা অধিক মর্যাদাশীল।

বর্তমান যুগে ইসলামের দাবিদারদের তুলনায় কাফিরদের তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ সম্পর্কে কম ধারণা ছিল না। তাদের নিকট ইলাহ ছিলেন সেই সত্তা যাকে বিপদাপদে ডাকা হত, যার জন্য মানত মানা হতো, যাঁর নামে পশু পাখী যবেহ করা হতো, যার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য চাওয়া হতো। কিন্তু এ সব বিষয়ে যদি মালাইকা, নবী-রাসূল, অলি-আউলিয়া, পীর-মুর্শীদ, বৃক্ষ, কবর, জিন, নদ-নদী প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা জানানো হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাদেরকেই ইলাহর আসনে বসানো হয়। নবীগণ কাফিরদের একথা বোঝাবার প্রয়োজন বোধ করেনি যে, আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা, আহারদাতা এবং সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপক-পরিচালক। কেননা কাফিররা এটা ভাল করেই জানত এবং স্বীকার করত এ সব গুণাবলীর অর্থাৎ সৃষ্টি করা, আহারদান এবং ব্যবস্থাপনা একমাত্র এক আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট আর কারো পক্ষেই তা করার ক্ষমতা নেই।

সে যুগের মুশরিকরা 'ইলাহ' এর সেই অর্থই বোঝত যা আজকালের মুশরিকরা 'সাইয়্যেদ' মুর্শিদ, পীর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে।

তাছাড়া সে যুগের মুশরিকরা 'ইলাহ' -এর সেই অর্থই বোঝত যা আজকালের মুশরিকরা 'সাইয়েদ' মুর্শিদ, পীর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে। নবী করীম (সা) তাদের নিকট যে কালেমায়ে তাওহীদ নিয়ে আগমন করেছিলেন সেটা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর এই কালিমার প্রকৃত তাৎপর্যই হচ্ছে, এর আসল উদ্দেশ্য, শুধু এর শব্দগুলোই উদ্দেশ্য নয়। কালিমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে যাবতীয় বস্তুর সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা। তাঁকে ছাড়া আর যাকে বা যে বস্তুকে উপাসনা করা হয় তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং এর থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র রাখা। আল-কুরআনের সূরা আল-ফাতিহার মধ্যেও এই কথাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা আল-ফাতিহা : ৪)

এ তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার আদেশ রয়েছে যেঃ

فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর ভরসা রাখ। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।" (সূরা গুদ : ১২৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

"অত:পর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলবে, আমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তিনি মহাআরশের অধিপতি।" (সূরা আত-তাওবা : ১২৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন:

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً

"তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুরই পালনকর্তা। সুতরাং তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পর্কে কাউকেও জানো?" (সূরা মারইয়াম : ৬৫)

সকল আসমানী গ্রন্থে এবং সকল নবী-রাসূল এ তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন এবং এর বিপরীত ধ্যান-ধারণা তথা শিরক ও অংশীবাদিতাকে নিষিদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (স) ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এ তাওহীদকে ফরয করেছে। দৃঢ়তার সাথে মহানবী এ তাওহীদের ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ ভাষায় এর বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ তাওহীদ ব্যতীত কোন মুক্তি নেই, কোন কল্যাণ নেই, সুখ শান্তির কোন অবকাশ নেই, যাবতীয় যুক্তি ও তথ্য প্রমাণাদি এ তাওহীদেরই অপরিহার্যতার প্রমাণ পেশ করে।

অতএব তাওহীদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার অধিকার যা মেনে নেয়া বান্দার উপর ফরয। তাওহীদ দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ বুনিয়াদ। সকল মূলনীতির মূল এবং আমলের ভিত্তি।

৩. توحيد الآسماء والصفات তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত-এর পরিচয়

তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ। আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব ও সৌন্দর্য্যের যাবতীয় গুণাবলীতে এক, একক এবং নিরংকুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। উপরোক্ত আকীদা পোষণ করার নামই হচ্ছে আসমা ও সিফাতের তাওহীদ।

আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলীতে এক, একক এবং নিরঙ্কুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। উপরোক্ত আক্বীদা পোষণ করার নামই হচ্ছে আসমা ওয়াস সিফাতের তাওহীদ।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার যে সকল গুণবাচক নাম রয়েছে অথবা রাসূল (সা) আল্লাহ তা'আলার যে গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রতি সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় গুণে গুণান্বিত ও ভূষিত। জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, চিরঞ্জীব প্রভৃতি বহু মহৎ গুণ আল্লাহ তা'আলার রয়েছে, যা আল-কুরআনে উল্লেখ আছে।

আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি গুণ অন্য গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উপরন্তু সে গুণাবলীও আল্লাহর মূল সত্তায় নিহিত এর বাইরে নয়। যেমন-আল্লাহ তা'আলার ইলম বা জ্ঞান। তাঁর গোটা সত্তাই ইলম। ঠিক যখন তিনি কুদরত গুণে ভূষিত, তখন তাঁর সত্তায় জ্ঞানের বাস্তবতা কুদরতের বাস্তবতা থেকে ভিন্ন নয়। বরং এর প্রত্যেকটিই অপরটির মধ্যে নিহিত। আর এ সবের ব্যাপক সমন্বয় রয়েছে আল্লাহর মহান সত্তায়।

শুধু তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যাহও জরুরি ভিত্তিতে পাওয়া যেতে হবে। কাফিররাও এ জাতীয় তাওহীদের বিশ্বাস করে, যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক পরবর্তীতে অস্বীকার করেছে। আবার তাদের এ অস্বীকৃতি মূর্খতার কারণে অথবা ইচ্ছকৃতভাবে। যেমন-আল্লাহ বলেন-

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ

"তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে।" (সূরা রা'দ : ৩০)

এ বিষয়ে হাফেয ইবনে কাসীর (র) বলেনঃ এ কথা অত্যান্ত স্পষ্ট যে, আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করাটা তাদের অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা এবং কুফরীর প্রতি লিপ্ততারই কারণ। কেননা জাহেলী যুগের অনেক কবিতায় আল্লাহ তা'আলার নামকে রহমান (দয়াময়) দ্বারা আহবান করা হয়েছে। যেমন কবি যুহাইর বলেনঃ

فلا تكتمن الله ما فى نفو سكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم

"তোমাদের মনের মধ্যে যা আছে তা তোমরা গোপন করো না। তোমরা যতই গোপন কর না কেন আল্লাহ তা জানতে পারেন।"

রহমান নামক আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ ছাড়া তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাতকে তারা অস্বীকার করত না। যদি তারা অন্যান্য গুণকে অস্বীকার করত তবে নিশ্চয় ঐ সকল গুণ নিয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে আপত্তি করত যেমনটি তারা তাওহীদে উলুহিয়্যাত-এর ব্যাপারে করেছিল। তারা বলেছিলঃ

أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

"সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক বিস্ময়কর ব্যাপার!" (সূরা সোয়াদ : ৫)

উপরের দলীল-প্রমাণ থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, তারা আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে রহমান ব্যতীত অন্যান্য গুণাবলী মেনে নিয়েছিল অথচ আল্লাহর রাসূল (স) তাদেরকে সেই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি, যার প্রতি তিনি আহবান জানিয়ে ছিলেন। এ তাওহীদের যে গুণটিকে তারা অস্বীকার করেছিল সেটি ছিল আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত বিশেষ গুণ যা আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অন্য কারো জন্য সে গুণে গুণান্বিত হওয়া বৈধ নয়।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ মানে-
ক. একমাত্র আল্লাহকে প্রতিপালক মনে করা; খ. আল্লাহর গুণাবলীতে অন্যকে শরীক করা;
গ. নামায পড়া; ঘ. সর্বকাজে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা।

২. কাফেরগণ আল্লাহর যে তাওহীদ স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তা হল-
ক. গুণাবলীর তাওহীদ; খ. রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ;
গ. সৃষ্টির তাওহীদ; ঘ. দাসত্ব ও আনুগত্যের তাওহীদ।

৩. মুসলিম হওয়ার জন্য-
ক. শুধু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত যথেষ্ট; খ. শুধু তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত যথেষ্ট;
গ. শুধু তাওহীদুল উলুহিয়্যাত যথেষ্ট; ঘ. সকল প্রকার তাওহীদের প্রয়োজন।

উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১. আল্লাহর সকল গুণ তাঁর সত্তার সাথে সম্পর্কিত।
২. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এককভাবে ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।
৩. কাফির-মুশরিকরা আল্লাহর রুবুবিয়্যাত সম্পর্কে বিশ্বাস করত।
৪. কাফিররা আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে রহমান গুণটি মেনে নিয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা দিন।
২. রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ বলতে কী বুঝেন? লিখুন।
৩. তাওহীদুল উলুহিয়্যাত কী? আলোচনা করুন।
৪. আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে তাওহীদ সম্পর্কে প্রমাণ দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী? দলীল-প্রমাণসহ লিখুন।

পাঠ-৩

আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা দিতে পারবেন;
- আল-কুরআনের আলোকে আল্লাহর একত্ববাদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিতে পারবেন;
- প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃংখলা ভিত্তিক আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দিতে পারবেন;
- আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রেও নেই এবং উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রেও নেই। তিনি সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতার অধিকারী এবং তাঁর মধ্যে কোন অপূর্ণতার লেশমাত্র নেই। এই নিখিল বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশীদার বা সমকক্ষ নেই এবং তিনিই একমাত্র ইলাহ বা উপাস্য অন্য কেউ তার মর্যাদায় আসীন হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের অনেক প্রমাণ রয়েছে।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ তাওহীদের বাণী কালে নির্যাসই হচ্ছে আল্লাহ একত্ববাদ। তাওহীদ আল্লাহর একত্ববাদে বি করা মুসলমান হওয়ার অপরিহার্য।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ তাওহীদের বাণী "কালেমার নির্যাসই হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ"। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য। ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবান করে। তাওহীদের আলোকেই একজন মুমিন বান্দার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। তাওহীদই বিশ্বজগতের আত্মা। এ জগত একমাত্র তাওহীদের শক্তিতেই টিকে আছে।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মানব ইতিহাসের প্রাথমিক অবস্থা থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তখন পৌত্তলিকতা বলতে কিছুই ছিল না। কেননা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করাটা ছিল মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবগত বিষয় আর এ ধারাই সকল নবী রাসূল তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে অব্যাহত রেখেছেন। হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত প্রত্যেকেই আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচার করেছেন। সমগ্র মানবজাতি তখন একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। যদিও পরবর্তীকালে মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে একত্ববাদের স্থলে বণ্ডত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে নিজেদেরকে ধংসের সম্মুখীন করেছে। নিম্নে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হলঃ

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র উপাস্য। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তুর স্রষ্টা। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে সমস্ত সৃষ্টির একচ্ছত্র অধিকারী আল্লাহ। তিনিই বিশ্বজগতের একক স্রষ্টা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। তাঁর অস্তিত্বের গুণাবলীতে, কার্যপ্রণালী ও বিধি-বিধানে অংশীদারীত্বের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে উপাস্য হিসেবে আহবান করা হয়, তারা শক্তিহীন এবং দুর্বল। যেমন, আল্লাহ তা'আলা নিকৃষ্ট একটি প্রাণির উদাহরণ দিয়ে তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥٓ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ

"হে মানুষ! একটি উপমা বর্ণনা করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে এ উদ্দেশ্যে একত্র

হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তাও উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়ই দুর্বল। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৩-৭৪)

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে অবিশ্বাসীদের বোকামী ও একত্ববাদের পরিবর্তে মূর্তিপূজা বা বগুত্ববাদে বিশ্বাসীদের অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা নিকৃষ্ট এবং ক্ষুদ্র প্রাণীর উদারহণ দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, তারা এতই দুর্বল ও অসহায় যে, তারা সকলে মিলে একটি নিকৃষ্ট ও ক্ষুদ্র প্রাণী মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। আর সৃষ্টি করা তো দূরের কথা বরং ক্ষুদ্র মাছি তাদের খাদ্য দ্রব্যের উপর যখন বসে এবং তা ভক্ষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের নেই। অতএব তারা তোমাদের বিপদ থেকে কীভাবে উদ্ধার করবে?

ব বিজ্ঞানীগণ ঊনবিংশ দির শেষ দিকে তাদের পূর্ববর্তী চিন্তা-গবেষণার ফসল বাদ দিয়ে সত্য দঘাটনের দিকে ফিরে সে বলেছেন: 'জীবনের পত্তি এবং তার চলমান তি শক্তিশালী একজন ষ্টিকর্তা ব্যতীত কল্পনা করাও মানুষের জন্যে াকামি ছাড়া আর কিছু নয়।'

স্বচ্ছ বিবেক ও প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে সত্যের দ্বারাপ্রান্তে নিয়ে যায়। যখন জ্ঞান তার সিঁড়ি বেয়ে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন সত্যকে অনুধাবন করা সহজ ও নিকটবর্তী হয়ে যায়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, জীব বিজ্ঞানীগণ ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে তাদের পূর্ববর্তী চিন্তা গবেষণার ফসল বাদ দিয়ে সত্য উদঘাটনের দিকে ফিরে এসে বলেছেন: 'জীবনের উৎপত্তি এবং তার চলমান গতি শক্তিশালী একজন সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কল্পনা করাও মানুষের জন্যে বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।'

মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বিশ্ব একটি গোপনীয় শক্তির অধীনে এরই নির্দেশে পরিচালিত যাকে বলা হয় প্রকৃতি। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাদের উপাস্য যাকে এই সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা হিসেবে সম্বোধন করা হয়। মার্কসবাদীরা একথা বলেন, এ বিশ্ব নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কাছে যে শক্তি প্রকৃতি নামে স্বীকৃত, মুসলমানদের কাছে সে শক্তিই আল্লাহ তা'আলা। আর দার্শনিকরা সেই শক্তিকে 'ইলাওল মুতাহাররিক আল-আউয়াল বা প্রথম শক্তিমান উপাস্য নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছেঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

"যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত বগু ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ২২)

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ

এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণ যা স্বভাবগত ও যুক্তিগত। এ আয়াত দ্বারা একাধিক ইলাহ এর অসারতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। একাধিক ইলাহ বা উপাস্যের ধারণা ভ্রান্ত, যার কোন মৌলিক ও জ্ঞানগত ভিত্তি নেই। কেননা একাধিক সৃষ্টিকর্তার ধারণা পৃথিবীতে ফ্যাসাদের কারণও হতো এবং পৃথিবী যে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবর্তমান তার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো। এমনকি যদি এ বিশ্বের দু'জন সৃষ্টিকর্তা থাকতো তা হলে এতে মৌলিক কোন বস্তু পাওয়া যেত না। কেননা স্রষ্টা বা উপাস্য তারা নিজেরাই অস্তিত্ব এবং গুণাগুণের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করতেন না আর তাদের মধ্যে বিরাজ করত দোষ-ত্রুটি এবং অপূর্ণতা। যদি সৃষ্টিকর্তা দোষ-ত্রুটি এবং অপূর্ণতা থেকে মুক্ত না থাকেন, তা হলে সৃষ্ট বস্তু ত্রুটিপূর্ণ হবে। আর তখন স্রষ্টা এবং সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

হ তিনিই হবেন যিনি রো অধীন নন, যাকে জ্ঞাসা করার অধিকার রো নেই। পরামর্শের দুই খোদা থাকলেও ত্যকেই অপরিহার্যরূপে কে জিজ্ঞাসা করার ও মর্শ বর্জনের কারণে কড় হওয়ার অধিকারী । আর এটা খোদায়ী দার সম্পূণ পরিপন্থী।

পৃথিবী ও আকাশে দু'জন সৃষ্টিকর্তা থাকলে উভয়েই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকর হওয়া উচিত। স্বভাবগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজন সেই একই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই খোদার নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে প্রচলিত হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কী হবে। এক খোদা চাইবে একজন জীবিত থাকুক, অপরজন চাইবে সে মৃত্যুবরণ করুক। একজন চাইবে এখন সূর্য উদয় হোক, অপরজন চাইবে এখন সূর্য অস্ত গিয়ে রাতের আঁধার নেমে আসুক। একজন চাইবে এখন বৃষ্টি হোক, অপরজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায়

উভয়ের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে? যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও খোদা থাকতে পারবে না। যদি যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, উভয় খোদা পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করবেন তাতে অসুবিধা কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্য জনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় বরং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণও নয়। বলাবাওল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে খোদা হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়া কর্ম জবাবদিহির অবকাশ রাখে, যিনি আইনের ঊর্ধে নন, তিনি খোদা হতে পারবেন না। খোদা তিনিই হবেন যিনি কারো অধীন নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারো নেই। পরামর্শের অধীন দুই খোদা থাকলেও প্রত্যেকই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় হওয়ার অধিকারী হবে। আর এটা খোদায়ী পদমর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং এ অভ্যাসগত যুক্তিতে আল্লাহর একত্ববাদ নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের নিয়ম-শৃংখলা ভিত্তিক প্রমাণ

এ নিখিল বিশ্ব এবং এর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এক নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে শৃংখলিত। এ নিয়ম-শৃঙ্খলা নিখিল বিশ্ব প্রতিটি বস্তু তথা অনু-পরমাণুকেও গ্রাস করেছে। কোন কিছুই এর বাইরে নয় এবং এর থেকে মুক্তও নয়। এ ধরনের সর্বব্যাপি ও চিরস্থায়ী নিয়ম-শৃঙ্খলা এক মহাপরিচালক সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রক গতি সম্পন্ন সত্তা ব্যতীত চিন্তা করা যায় না। যেমন- পবিত্র কুরাআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ـ

"নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা সবই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।" (সূরা আলে-ইমরান : ৮৩)

এ আয়াতে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক বা স্বভাবগত প্রমাণ

এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই আল্লাহকে স্বীকার করে। কেউ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, কেউ রিযিকদাতা হিসেবে, কেউ প্রকৃতি হিসেবে, কেউ বা মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিশ্বাস করে। আর এ বিশ্বাস জীবনের কোন এক সময়ে অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এ পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষই আস্তিক। তারা তাদের ধর্ম-কর্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহকে স্বীকার করে। মানুষের অন্তরে যে আধ্যাত্মিক জ্যোতি রয়েছে, সেটাই তাকে এক পরাক্রমশালী শক্তির সন্ধান দেয়। মানুষের আত্মা আল্লাহর নিকট থেকে আগত বিধায় এ আত্মা আল্লাহর দিকেই ধাবিত থাকে। প্রতিটি মানুষের এই আল্লাহ মুখিতা ও আল্লাহ প্রবণতা আল্লাহ তা'আলার একত্বের একটি প্রমাণ বিশেষ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন :

এ পৃথিবীর প্রতিটি মান আল্লাহকে স্বীকার করে কেউ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কেউ রিযিকদাতা হিসে কেউ প্রকৃতি হিসেবে, বা মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক হিসেবে।

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلعَزِيزُ ٱلعَلِيمُ

"তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো তো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আয-যুখরুফ : ৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِى ٱلأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ

"বল, আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকব যে আমাদের কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব, যাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে, যদিও তার সহচরগণ তাকে সঠিক পথে আহবান করে বলে, আমাদের নিকট এসো? বল, আল্লাহর পথই পথ।"। (সূরা আল-আনআম : ৭১)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে নিজেই ঘোষণা করেনঃ

لاَ تَتَّخِذُواْ إِلَـٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ

"তোমারা দু'জন ইলাহ গ্রহণ করো না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ। (সূরা আন-নাহল : ৫১)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেছেন :

مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّـهِ عَمَّا يَصِفُونَ

"তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে কত পবিত্র!" (সূরা আল-মুমিনুন : ৯১)

মানুষ তার চারপাশে তাকালে দেখতে পায় যে, সৃষ্টির আদি হতেই নিখিল বিশ্বের সব কিছু একই নিয়মে চলছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই একই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না, কোনো অনিয়ম ঘটছে না, কোনো বিশৃংখলার সৃষ্টি হচ্ছে না। এ নিয়মের ব্যাঘাত ঘটাবার ক্ষমাতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, একই সৃষ্টি কর্তার নির্দেশে ও আনুগত্যে বিশ্বের সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। একের অধিক সৃষ্টিকর্তা থাকলে নিয়ম-শৃংখলা বিরাজমান থাকা কখনও সম্ভব হতো না।

সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে ও আনুগত্যে বিশ্বের সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। একের অধিক সৃষ্টিকর্তা থাকলে নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরাজমান থাকা কখনও সম্ভব হতো না।

মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একাধিক নয় এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নন। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে।" (সূরা কাফ : ৩৮)

গোটা বিশ্বপ্রকৃতিই আল্লাহর একত্ববাদের জ্বলন্ত প্রমাণ। যেমন: আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্ত, আবহাওয়ার পরিবর্তন, উদ্ভিদ ও প্রাণি জগতের বৈচিত্র্য, মানুষের মুখের ভাষা ও রং এর বিস্তার প্রভৃতি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদেরই নিদর্শন।

বিশ্বের সব কিছুই যে এক আল্লাহর নিয়ম মেনে চলছে তা পবিত্র কুরআনেও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেমন:

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তোমরা তাদের সেই প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বুঝতে পার না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৪৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً

"আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা সবই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করে।" (সূরা আলেইমরান : ৮৩)

এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্যই প্রকৃতির নিয়ম এবং এ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে বিশ্ব চির গতিশীল ও কর্মচঞ্চল রয়েছে।

প্রত্যাদেশ ভিত্তিক প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলগণের প্রতি

প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন। প্রত্যাদেশ বা ওহী আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। এই ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির নিকট তাঁর সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব, গুণাবলী ও ক্ষমতার কথা বলেছেন। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যে সঠিক শিক্ষা দান করেছেন। হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই একত্ববাদের বাণী প্রচার করেছেন। যদি সেখানে একাদিক উপাস্য থাকতো তাহলে হিদায়াতের ধারাও ভিন্ন হতো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক নবী ও রাসূলগণই মানুষকে দ্বিত্ববাদ, বণ্ডত্ববাদ, অংশীদারবাদ থেকে একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। নবী ও রাসূলগণের এ দাওয়াতের ধারাবাহিকতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একক সত্তার ও আধিপত্যের ঘোষণা দিয়ে বলেনঃ

فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

"তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল এবং যে নূর আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস কর। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয় সর্বজ্ঞ।" (সূরা আত-তাগাবুন : ৮)

ইসলামের প্রত্যয় ও আচরণের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। প্রত্যয় বিশ্বাসের আর যতো দি রয়েছে তা হচ্ছে ঐ এ মূলকাণ্ডেরই শাখা-প্রশ মাত্র।

তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য এবং এ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে চিন্তা চিরগতিশীল ও কর্মচঞ্চল রয়েছে।

আল্লাহ একত্বের প্রতি বিশ্বাসের আবশ্যকতা

ইসলামের প্রত্যয় ও আচরণের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। প্রত্যয় ও বিশ্বাসের আর যতো দিক রয়েছে তা হচ্ছে ঐ এক মূলকাণ্ডেরই শাখা-প্রশাখামাত্র। ইসলামের যতো নৈতিক বিধি ব্যবস্থা ও সামাজিক আইন- কানুন রয়েছে তা ঐ কেন্দ্র বিন্দু থেকেই উৎসারিত। এখানকার প্রতিটি জিনিসেরই উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে আল্লাহর একক সত্তা। ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, কিয়ামত ও আখিরাত, ফরয ও ওয়াজিব এক কথায় ইসলামের প্রতিটি জিনিসের ভিত্তি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ একটি মাত্র জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে ফিরিশতা, কিয়ামত ও আখিরাতে বিশ্বাস একেবারে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। নবী-রাসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবাদি আনুগত্য লাভের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফরয, ওয়াজিব, আনুগত্য অধিকার ইত্যাদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। আদেশ-নিষেধ ও বিধি ব্যবস্থায় কোন বাধ্য-বাধকতা থাকে না। মোটকথা, এ একটি মাত্র কেন্দ্রবিন্দু অপসৃত হলেই গোটা ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। বরং ইসলাম বলে কোন জিনিসেরই অস্তিত্ব থাকে না।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা-
   ক) মানব ইতিহাসের প্রথম থেকে শুরু হয়;
   খ) হযরত নূহ (আ) থেকে শুরু হয়;
   গ) হযরত ইব্রাহীম (আ) থেকে শুরু হয়;
   ঘ) হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে শুরু হয়।

২. 'আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র উপাস্য' এটি-
   ক) ইয়াহূদী মতবাদ;
   খ) ইসলামি মতবাদ;
   গ) খ্রিষ্ট মতবাদ;
   ঘ) আর্য মতবাদ।

৩. মার্কসবাদের ধারণা হলো-
   ক) আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়;
   খ) আল্লাহ বলতে কোন সত্তা নেই;
   গ) এই বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন;
   ঘ) এ বিশ্ব নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে।

৪. ইসলামের মৌলিক বিষয় হচ্ছে-
   ক) সুখ-শান্তি;
   খ) জান্নাত লাভ;
   গ) রাসূলের আনুগত্য;
   ঘ) আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. একত্ববাদ কী? আলোচনা করুন।
২. আল-কুরআন থেকে একত্ববাদের প্রমাণ দিন।
৩. একত্ববাদের স্বপক্ষে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করুন।
৪. আল্লাহর একত্ববাদের নিয়ম-শৃংখলা ভিত্তিক প্রমাণ দিন।
৫. একত্ববাদের পক্ষে প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত প্রমাণ উপস্থাপন করুন।
৬. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের আবশ্যকতা কী? বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয় যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করুন।

পাঠ-৪

ঈমান ও ইসলাম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ঈমানের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইসলামের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইসলাম মানুষের স্বভাব-ধর্ম তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা -এর প্রমাণ দিতে পারবেন।

ঈমানের পরিচয়

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ-বিশ্বাস, কারো প্রতি আস্থা পোষণ করে তার কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর রাসূল (স) আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর নিকট থেকে যে জ্ঞান ও হিদায়াতের বাণী বিশ্ববাসীর নিকট পেশ করেছেন, তা সবই সত্য বলে বিশ্বাস করা ও সর্বতোভাবে কবুল করাকে ঈমান বলা হয়। ইসলামি শরীআত অনুযায়ী ঈমানের আসল সম্পর্ক হচ্ছে, সে সকল অদৃশ্য বিষয়ের সাথে যা আমাদের ইন্দ্রিয় বা অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহর রাসূল আমাদে ইন্দ্রিয়াতীত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর নিকট থেকে যে জ্ঞান ও হিদায়াতের বাণী বিশ্ব নিকট পেশ করেছেন সবই সত্য বলে বিশ্বা ও সর্বতোভাবে কবুল করাকে ঈমান বলা হ

মুসলিম পণ্ডিতগণ ঈমানের সংজ্ঞার ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল-

অধিকাংশ মুহাদ্দিস, যেমন ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেঈ (র) প্রমুখের মতে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং রাসূল (স) আনিত জীবন বিধানকে কার্যে পরিণত করার নাম ঈমান। মুতাযিলা ও খারিজী সম্প্রদায়ের অভিমতও অনুরূপ।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আন্তরিক বিশ্বাসের নাম ঈমান, মৌখিক স্বীকৃতি ঈমান এর জন্য শর্ত এবং আমল হল ঈমানের পরিপূর্ণতা দানকারী।

কাররামিয়া সম্প্রদায়ের মতে, 'ঈমান' কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম।

ঈমান অর্থ হল, শরীআতের যাবতীয় শুকুম-আহকাম অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং এগুলোকে নিজের দীন হিসেবে বরণ করে নেওয়া। পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যিনি শরীআতের বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন এবং এগুলোর মৌখিক স্বীকৃতিসহ বাস্তব জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে আমল করে চলেন।

ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ

ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। ঈমানে মুফাসসাল শীর্ষক বাক্যে সেই বিষয়গুলোর সহজ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন:

امنت بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعا لى والبعث بعد الموت

"আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, আখিরাতের উপর, তাকদীরের ভাল-মন্দ সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়-এর উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার উপর।"

উল্লিখিত ঈমানের মৌলিক বিষগুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং সে অনুযায়ী কাজে পরিণত

করা ব্যতীত কস্মিনকালেও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখবেন, মুখে স্বীকার করবেন এবং কর্মে পরিণত করবেন তাকেই মুমিন বলা হবে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে ঈমানের মৌলিক সাতটি বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

"রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং রাসূলগণে ঈমান এনেছে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮৫)

সূরা বাকারার ১৭৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

"পুণ্য আছে কেবল আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৭৭)

ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

যারা ঈমানদার নয় তারা মুসলমান নয়। তাই মুসলিম জীবনে ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

ঈমান মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে

ঈমান বা বিশ্বাস অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে আলোর পথ দেখায়। কোন মানুষ যখন কালেমা পাঠ করে ঈমানদারদের দলভুক্ত হয়, তখন মন ও ধ্যান-ধারণায় আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়, যার দরুন সে কুচিন্তা পরিহার করে সৎকর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। এদিক থেকে বিচার করলে ঈমানকে এমন এক পরশ পাথর বলা যায়, যার ছোঁয়ায় মানুষের অসৎ চিন্তাধারা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তাই একজন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই চুরি, ডাকাতি, খুন ও রাহাজানিসহ কোন প্রকার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না।

ঈমান মনে ও কর্মে বিপ্লব সৃষ্টি করে

মন মানুষের দেহকে পরিচলিত করে। দেহ যদি হয় একটি গাড়ির বগি, তাহলে মন হল সে গাড়ির ইঞ্জিন। মনের চিন্তাধারা, অনুভূতি ও ইচ্ছাই ব্যক্তির কর্মে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ মানুষের মনোজগতই তার সকল কর্ম ও সকল প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমি। তাই মনে যখন কোন পরিবর্তন দেখা দেয়, তখন তা অবশ্যই কর্মে প্রতিফলিত হয়। ভাল কর্ম সম্পাদন করতে হলে ভাল চিন্তা ভাবনার দরকার হয়। তাই শুভ কাজ সম্পাদনের জন্য ঈমান বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

ঈমান মনোবল ও সাহস সঞ্চার করে

আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস মানুষের মধ্যে অপরিসীম মনোবল ও অফুরন্ত সাহস সঞ্চার করে। ঈমানদার মানুষ যখন কোন বিপদাপদ ও উত্থান-পতনের সম্মুখীন হয়, তখন সে শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করে। কেননা তার সাহস ও মনোবল এত মজবুত যে, সে পার্থিব কোন লোভ-লালসায় আকৃষ্ট হয় না। জীবনের সর্বাবস্থায় সে এক পরম শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে যা তাকে সুখের আতিশয্যে দিশেহারা না হতে এবং দুঃখের দিনে হতাশ না হতে সাহায্য করে।

ঈমান মানুষকে নম্র ও বিনয়ী করে

যারা প্রকৃত ঈমানদার তাদের ধন-সম্পদ ও বিদ্যা বুদ্ধির দর্প থাকতে পারে না। কেননা তারা মনে করে, তাদের যা কিছু আছে সবই মহান আল্লাহর দান। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তেই এগুলো

কেড়ে নিতে পারেন। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তাই ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সকলকেই সে সমান চোখে দেখে। তার মনে কখনো অহংকারের ছায়াপাতে কালিমা লিপ্ত হতে পারে না। সে বিনয় ও নম্রতার সাথে সকলের সঙ্গে দিনাতিপাত করে এবং আল্লাহর দানের শুকরিয়া আদায় করে।

ঈমান ধৈর্য ধারণের প্রেরণা যোগায়

মহান প্রভুর প্রতি অবিচল বিশ্বাসই মানুষকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি যোগায়। জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ বিপদাপদ, দুঃখ-বঞ্চনা এমনকি মৃত্যুর বিভীষিকাও তার মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারে না। আল্লাহর প্রেম তার মন হতে সকল ভয়-ভীতি অপসারণ করে তাকে এক দুর্দমনীয় মনোবলের অধিকারী করে তোলে। শত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েও আল্লাহর প্রতি আস্থা থেকে তাকে ফিরানো যায় না।

ঈমান মানুষকে নির্ভুল জীবন পথের সন্ধান দেয়

ঈমানদার ব্যক্তি শুধু আল্লাহর একত্বেই বিশ্বাস করে না, সে বিশ্বাস স্থাপন করে নবী-রাসূলগণের প্রতি, আসমানী কিতাবের প্রতি এবং পরকাল বা শেষ বিচারের প্রতি। তাই সে নবীগণের প্রদর্শিত পথেই জীবন যাপনের চেষ্টা করে। ঈমানী শক্তির বলেই সে নিজেকে আল্লাহর আদর্শ বান্দা ও রাসূলের প্রকৃত উম্মাত হিসেবে গড়ে তোলে।

ঈমান মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে

ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সকল কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর করুণার ওপর নির্ভরশীল। এ দৃষ্টিভঙ্গি একজন ঈমানদারকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সারা বিশ্বই আল্লাহর সাম্রাজ্য। কেননা ঈমান তার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। দেখার দুটি চোখ ছাড়াও তার এমন দুটি ঈমানী চোখ থাকে যা দ্বারা সে সমস্ত বিশ্বের সব কিছুই দেখে নিতে পারে।

ঈমান আত্মসম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমিয় বাণী ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরকে স্বচ্ছ করে দিয়েছে। তাই সে অনুভব করতে পারে, পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাসবোধ তার আত্মশক্তিকে মজবুত করে দেয়। সে বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তাই সকল গুণগান বা প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। এ বিশ্বাসই একজন মানুষের মনে আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে এবং মহৎ জীবন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে।

ঈমান ইসলামের মৌল ভিত্তি

ঈমান হচ্ছে ইসলামের মূলভিত্তি। ঈমান মুসলিম জাতির প্রাণশক্তির মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত। জীবন-মরণে, সুদিন-দুর্দিনে বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপরই নির্ভরতা একত্ববাদের মূলকথা।

ঈমান অনবদ্য চেতনা

ঈমান এক অনবদ্য চেতনা। আল্লাহর একত্ববাদ মুমিনের অফুরন্ত প্রেরণা আত্মার পরম পুলক। জীবনের দুর্যোগময় মুহূর্তে অথবা আনন্দমুখর হাস্যোজ্জ্বল দিনে কোন অবস্থায়ই মুমিনকে একত্ববাদের পথ থেকে একবিন্দুও বিচ্যুত করা যায় না।

ঈমান জীবন চলার দিশারী

ঈমান মুমিনের জন্য জীবন চলার পথের একমাত্র দিশারী।

বণ্ডত্ববাদের নাকচ : এক ভিন্ন একাধিকের কোন স্থান এখানে নেই। মুমিনের অন্তরে আল্লাহ একক অধিকারে সমাসীন। তাই বণ্ডত্ববাদ, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, না খোদাবাদ ও পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম আপোসহীন।

অন্যের সামনে মুমিনের মাথা অবনত হয় না

ঈমানদার আল্লাহর পর আর কাউকে বড় মনে করে না। তারা আল্লাহর প্রতিনিধি। এ বিশ্বাসের ফলে তারা কোন সৃষ্টিজীবের কাছে মাথা নত করে না। বিশ্বাসী কখনো অপমাণিত, বিজিত ও অপরের গুকুমের তাবেদার হয় না। সদা সর্বদাই সে চির বিজয়ী ও মর্যাদাবান নেতা, আর তাই বিশ্বাসের ফলে সে চির বলীয়ান থাকে।

ঈমান মানবাত্মাকে করে চির উন্নত, হৃদয়কে করে বিমল পুণ্যালোকে সমুদ্ভাসিত। তার চির উন্নত শির আল্লাহ ছাড়া কারে কাছে অবনত হয় না। তার হাত কারো সামনে প্রসারিত হয় না।

বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে। এর ফলে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয় এবং সংকল্প হয় সুদৃঢ়।

মুমিন ইন্দ্রীয় পুঁজারী হয় না

ঈমানদার কখনো অতি আরামপুজারী ইন্দ্রীয়পরতার দাস বলগাহারা ও লোভাতুর হয় না। সৎ ও পরিশ্রমলব্ধ জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়, তাই তার চেয়ে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী আর কেউ নয়। ঈমানদার সকলের অধিকার পূরণ করে, সৃষ্টির কল্যাণে সদা ব্যস্ত থাকে; ফলে গোটা সৃষ্টি তার বন্ধু ও প্রিয়জন হয়ে ওঠে।

ঈমান কর্ম চেতনার মূল উৎস

ঈমানের ফলে মানুষের সকল কাজ চলে একটি অপরিমেয় চেতনায় ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে। তার কোন কাজ বিফলে যায় না। তার সব কাজ আল্লাহ দেখছেন। এ ঈমানের ফলে মানুষের মনোজগতে সৃষ্টি হয় এক অপার ও দুর্বারগতি ও চেতনা, যা সমগ্র কর্ম চাঞ্চল্যের মূল উৎস।

ঈমান মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে

বিশ্বাস মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে। সমগ্র বিশ্বকে আল্লাহর রাজ্য বলে মনে করার ফলে সমগ্র বিশ্বকেই বিশ্বাসীগণ আপন মনে করে। আল্লাহর একত্বের ধারণা মুমিনকে সংকীর্ণতার বেষ্টনী হতে মুক্ত করে উদারতা ও আন্তর্জাতিকতার বলয়ে নিয়ে আসে। ফলে সে হয়ে ওঠে উদার ও আন্তর্জাতিক।

স্বার্থপরতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে

ঈমানের ফলশ্রুতিতে মানুষ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে সকল সৃষ্টিলোকের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় সে সকল কাজ করে থাকে। সে সকলকে আপন বলে ভাবে এবং নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অপরের সুবিধার কথা চিন্তা করে। তাই তার মধ্যে লোভ- লালসা, কামনা-বাসনা ও হীনস্বার্থপরতা জন্ম নিতে পারে না।

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র শাশ্বত জীবন দর্শন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের নাম হল ঈমান। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর মাঝে ঈমানের অবস্থান সবার উপরে। ঈমানের সাথে ইসলামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি আরেকটির অবিচ্ছেদ্য অংগ। একটি আরেকটির পরিপূরক। ইসলাম ব্যতীত ঈমানের যেমন কোন ভিত্তি নেই, তেমনি ঈমান ছাড়া ইসলামের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই ঈমান ও ইসলাম শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

আভিধানিক অর্থ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম শব্দটি সিলমুন (سلم) ও সালামুন (سلام) শব্দ হতে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ-আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা, নিরাপদ থাকা, নিরাপত্তা দেওয়া ও লাভ করা। যেমন মহানবী (স) বলেন, اسلم تسلم -"যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর (আত্মসমর্পণ কর) তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে।" (বুখারী)

পারিভাষিক অর্থ

ইসলাম হচ্ছে, বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি আত্মরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কাছে পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা। বিনা দ্বিধায় তাঁর বিধানাবলী ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

ইসলাম হচ্ছে, বিশ্বস্র মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসম করা। বিনা দ্বিধায় তাঁ বিধানাবলী ও আদেশ নিষেধ মেনে চলা।

মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ এর সংজ্ঞায় বলেন, মনেপ্রাণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দান করে ইসলামের অনুশাসনগুলো পালন করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার নাম ইসলাম।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন-

الاسلام : التسليم والانقياد لاوامر الله تعا لى .

"ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার সকল আদেশকে মেনে নেওয়া ও আত্মসমর্পণ করা।"

শরীআতের পরিভাষায়- আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র 'দীন' -একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচারের ভিত্তিতে শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই, হতেও পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلاَمُ

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৯)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না।" (সূরা আলে-ইমরান : ৮৫)

ইসলামের একটি সংজ্ঞা ও পরিচিতি হাদীস শরীফে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন :

الاسلام أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله و تقيم الصلوة و تؤتى الز كوة و تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .

"ইসলাম হল একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা পালন করা এবং যাতায়াতের সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ আদায় করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

বস্তুত ইসলামই সকল নবী-রাসূলের অভিন্ন ধর্ম। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত আগমনকারী সকল নবী-রাসূল মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মাতকে গড়ে তুলেছেন।

ইসলাম ধর্মের মর্ম হল, আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আর প্রত্যেক পয়গাম্বরই যেহেতু নিজে আল্লাহর পূর্ণ অনুগত থাকার সাথে সাথে উম্মাতকেও এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাই সকল নবীর দীনই ইসলাম।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-ই সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের নাম ইসলাম ও তার উম্মতকে উম্মতে মুসলিমা বলে অভিহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর হতেও তোমার এক অনুগত উম্মত বানাও।" (সূরা আল-বাকারা : ১২৮)

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সন্তানদের উপদেশ দিয়ে বলেন :

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"তোমরা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আল-বাকারা : ১৩২)

হযরত ইবরাহীম (আ) উম্মতে মুহাম্মদীকে এ নামে অভিহিত করেছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا

"এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি ইত:পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও।"(সূরা আল-হজ্জ : ৭৮)

মোটকথা নবী ও রাসূলগণের প্রচারিত ধর্মে মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকের শরীআত ছিল ভিন্ন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীআত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করেছি।" (সূরা আল-মায়িদা: ৪৮)

হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে নবী-রাসূলগণের যে ধারবাহিকতা শুরু হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে। তিনি আখেরী নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। তাঁর আগমনে পুর্ববর্তী সমস্ত শরীআত রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন 'ইসলাম' বলতে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আনীত শরীআতকে এবং মুসলিম বলতে উম্মতে মুহাম্মদীকেই বুঝায়। এ হিসেবে ইসলামের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

লাম' বলতে হযরত হাম্মদ (স) আনীত তকে এবং মুসলিম বলতে উম্মতে হাম্মদীকেই বুঝায়।

هو تصديق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة.

"আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (স) যে আদর্শ ও বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন এবং যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকে ইসলাম বলা হয়।"

ল্লাহ তা'আলার পক্ষ হযরত মুহাম্মদ (স) আদর্শ ও বিধি-বিধান য়ে এসেছেন এবং যা টাভাবে প্রমাণিত তা প্রাণে বিশ্বাস করাকে ইসলাম বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশনা মুতাবেক নিজেকে আল্লাহর নিকট সঁপে দেওয়া এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার নামই হল ইসলাম। যে আত্মসমর্পণ করে তাকে বলা হয় মুসলিম। ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন ব্যক্তির ইসলাম পরিপন্থী নিজস্ব খেয়াল-খুশি এবং ধ্যান-ধারণার আলোকে অনুসরণের কোন সুযোগ থাকে না। সে তো আল্লাহর গোলাম। তার জীবন-মরণ সব কিছুই এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً

লাম হচ্ছে, বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি কভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কাছে পূর্ণ নুগত্য ও আত্মসমর্পণ রা। বিনা দ্বিধায় তাঁর ধানাবলী ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা আল-আহযাব : ৩৬)

এ আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। তিনি জীবনের কোন ক্ষেত্রে এক বিন্দু পরিমাণও এ থেকে বিচ্যুত হননি। সাহাবায়ে কিরামকে একইভাবে গড়ে তুলেছিলেন তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ

তত্ত্বাবধানে।"

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম-দীনে ফিতরাত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাই হল 'ফিতরাত'। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে :

كل مولود يولد على الفطرة

"প্রতিটি শিশুই সহজাত প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে।"

মহান আল্লাহ বলেন-

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে ফিরিয়ে নাও। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা আর-রুম : ৩০)

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ তা'আলার আখেরি নবী। কুরআন তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আখেরী কিতাব। মহানবী (স)-এর আগমনের পর পূর্ববর্তী শরীআত ও কিতাব সবই রহিত হয়ে গেছে। এরপর আর কোন নবী আসবেন না এবং কোন কিতাবও নাযিল হবে না। যাঁরা এ আকীদা পোষণ করবেন তারা মুসলিম। আর যারা এ আকীদা পোষণ করবে না, তারা অমুসলিম-কাফির।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে কোন খুঁত নেই, নেই কোন অপূর্ণতা। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلاَمَ دِيناً

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

কুরআন মজীদে আরও ইরশাদ হয়েছে :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلّ شَيْءٍ

"আমি তোমার প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে প্রতিটি বস্তুর স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান।" (সূরা আন-নাহল : ৮৯)

এতে এ কথা বোঝা যায় যে, মানব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুর নীতি নির্ধারণী বিবরণ আল-কুরআনে আছে। প্রয়োজনীয় জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সবকিছুই নির্ধারণ করতে হবে।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক জীবনব্যবস্থা যা ভারসাম্যপূর্ণ, স্বভাবসম্মত এবং মানবিক সামর্থ্যের উপযোগী। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮৬)

ইসলাম শান্তিপূর্ণ, নির্ভেজাল এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাতে চায়। মানব জীবনের

কোন একটি বিষয় অথবা কোন একটি দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট করাকে ইসলাম কোনক্রমেই সমর্থন করে না। ইবাদাত- বন্দেগী, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-আচরণ ও আমল-আখলাক তথা জীবনের কোন স্তরে এমন কিছু করা আদৌ ইসলাম সম্মত নয়, যা ঈমান ও মানবতার ক্ষতি সাধন করে।

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম নিজেদের মত অন্যদেরকেও ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, সমাজের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা যোগায়। আর তাতেই বিশ্ববাসীর জীবন ধারায় নেমে আসে প্রশান্তি এবং বিদূরিত হয় অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ এবং হানাহানি। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা। সমগ্র মানবজাতি একই পরিবারভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন :

الخلق عيال الله

"সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারের ন্যায়।" (মিশকাত)

বস্তুত, সমগ্র মানবজাতি একটি দেহের মত। কেননা আমরা সকলেই আদম ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" (সূরা আল-গুজুরাত : ১৩)

মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ আবশ্যক। তাই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলাম শুধু মানুষের প্রতিই সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয়নি, উপরন্তু প্রাণীর পরিচর্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্ভিদের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কেও ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন:

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.

"যারা দয়া করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর তাহলে আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (তিরমিযি ও আবু দাউদ)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে আরাফাত হতে মুযদালিফার দিকে যাচ্ছিলেন। তখন নবী করীম (স) তাঁর পিছনে উট হাকানো এবং প্রহারের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি তাদের দিকে ফিরে চাবুক দিয়ে ইশারা করে বললেন, হে লোকসকল! তোমরা ধীর-স্থিরভাবে চল। কেননা উট দৌড়িয়ে নিয়ে যাওয়া কোন নেকীর কাজ নয়।" (মিশকাত, হজ্জ অধ্যায়)

মোটকথা সমস্ত সৃষ্টি-জড়, অজড়, প্রাণি ও প্রকৃতি সকলেই ইসলামের উদারতায় উদ্ভাসিত। ইসলাম শুধু বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম নয়। বরং তা বিশ্বাস ও কর্মের এক সুষম সমন্বয়ের বাস্তব অভিব্যক্তি। সে জন্যই বৈরাগ্যবাদ ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেনঃ

لا رهبا نية فى الإسلام

"ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই।"

এই হাদীসের এ বাণী প্রতিটি মানুষকে নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, পরের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য তথা বিশ্বের জন্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মই মূলত মানুষের মানবীয় পরিচয় বিকাশের এবং

মনুষ্যত্ব প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানকে তার নিত্যদিনের চিন্তা-কর্মে এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে, সে আল্লাহর বান্দা এবং নবী (স)-এর উম্মত।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬)

উল্লিখিত আয়াতে যে ইবাদতের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সে ইবাদাত শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং উপরোক্ত আমলের আগে পরে কর্মমুখর মুহূর্তগুলোতেও আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে যেন বৈষয়িক লোভ-লালসায় পড়ে কেউ পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী না হয়ে যায়। প্রতিদিনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের অনুসরণই হল উল্লিখিত আয়াতে ইবাদতের মূল তাৎপর্য।

ইসলামের পথে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে

বিশ্বাসী মানুষ সকলেই এক পরিবারের, একই জাতির বলে নিজেদের মনে করে। দেশ, কাল, ভাষা, বর্ণ, গোত্র কোন বিভেদই তাদের মধ্যে অনৈক্য বা বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। সবাই মিলে হয় এক অখণ্ড জাতি। তারা সব সময় ঐক্য কামনা করে। আল্লাহর পথে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। যেমন-আল্লাহর বাণী:

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)

পরিশেষে বলা যায়, ঈমান ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু ও ইসলামের মূল ভিত্তি। এর ওপর মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম ফল নির্ভরশীল। মানুষের জীবনের প্রকৃতি নির্ভর করে তার বিশ্বাসের ওপর। ঈমানের ওপরই ইসলামের গোটা প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। এর অভাবে ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মোটকথা, মানুষ যা বিশ্বাস করে সেভাবেই জীবন পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়। এক কথায় বলা হয়, ঈমান প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সকল সৎকর্মের মূলভিত্তি। তাই মানব জীবনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলাম-এর শাব্দিক অর্থ-
   ক) শান্তি;
   খ) সুখ;
   গ) আত্মসমর্পণ করা;
   ঘ) কোনটিই সঠিক নয়।

২. ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সকল আদেশকে মেনে নেওয়া ও আত্মসমর্পণ করা- এটি কার উক্তি?
   ক) হযরত আবু বকর (রা)-এর;
   খ) হযরত আয়িশা (রা)-এর;
   গ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর;
   ঘ) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর।

৩. ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম-এটি কার কথা?
   ক) কাররামিয়াদের;
   খ) শিয়াদের;
   গ) মুতাযিলাদের;
   ঘ) খারেজীদের।

৪. ইমাম আবু হানীফার মতে মুখে স্বীকৃতি প্রদান-
   ক) ঈমানের শর্ত;
   খ) ঈমানের পূর্ণতা দানকারী;
   গ) ইসলামের শর্ত;
   গ) প্রয়োজন নেই।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামের পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. ইসলামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম আবু হানীফা কী বলেছেন? লিখুন।
৩. ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম-বুঝিয়ে লিখুন।
৪. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-ব্যাখ্যা করুন।
৫. 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের অবকাশ নেই' বুঝিয়ে লিখুন।
৬. ঈমানের পরিচয় দিন।
৭. ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো কয়টি এবং কী কী? লিখুন।
৮. ঈমানের গুরুত্ব লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-এ ব্যাপারে আপনার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।
২. ঈমানের পরিচয় দিন। ঈমানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

পাঠ-৫

শিরক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- শিরক কী তা বলতে পারবেন;
- শিরকের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিরক-এর পরিচয়

শিরক অর্থ শরীক করা বা অংশীদার স্থাপন করা। একাধিক বিশ্ব নিয়ন্তা, একাধিক বিশ্বস্রষ্টা ও একাধিক মাবুদ বা ইলাহে বিশ্বাস করার নাম শিরক। এই বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা বা কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা বা কাউকে সমগুণ সম্পন্ন মনে করাই শিরক। শিরক তাওহীদের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলার পাশাপাশি কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহর সমতুল্য, সমগুণ সম্পন্ন ও সমশক্তি সম্পন্ন ধারণা বা বিশ্বাস করা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। আবার যে সকল ইবাদাত আল্লাহ তা'আলার জন্যে নির্দিষ্ট সেগুলোর সাথে অন্য কাউকে উপস্থিত করা এবং তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়াও শিরক। যদি কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন মৃত বুজুর্গ ব্যক্তি, পীর-আউলিয়ার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করে তবে তা শিরকে পরিণত হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা এবং তাদের নিকট থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা করা শিরক। বিপদ-আপদে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে উন্নতি কামনা করা-এ সবই শিরক।

শিরকের প্রকারভেদ

শিরক দু'ভাগে বিভক্ত

১. শিরকে আকবার বা বড় শিরক
২. শিরকে আসগার (শিরকে খাফী) বা ছোট শিরক।

শিরকে আকবার বা বড় শিরক

শিরকে আকবার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার বানানো। আল্লাহকে ডাকার মতো অন্য কাউকে ডাকা, আল্লাহকে ভয় করার মতো অন্য কাউকে ভয় করা, আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয় তা অন্য কারো নিকট চাওয়া। আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার ন্যায় অন্যকে অনুরূপ বা ততোধিক ভালোবাসা। আল্লাহর সাথে যাকে অংশীদার করা হয় যে, কোন ধরনের ইবাদাত তার জন্য নির্দিষ্ট করা। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান অবশিষ্ট থাকে না। এ ধরনের মুশরিকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। জাহান্নামই হচ্ছে তাদের শেষ ঠিকানা।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদিত ইবাদাতকে ইবাদাত, উসীলা অথবা অন্য যে কোন নামে আখ্যায়িত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ এ সবই হচ্ছে শিরকে আকবার বা বড় শিরক। এ ধরনের শিরকের বিচার্য বিষয় হচ্ছে, বস্তুত হাকিকাত বা প্রকৃত পরিচয়। শব্দ ও বাক্য এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়।

শিরক কুফরীর মতোই ঘৃণ্য পাপ। আল্লাহ তা'আলা শিরককে অমার্জনীয় অপরাধ বলে আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন পৌত্তলিকদের সম্বন্ধে কুফর ও শিরক এ উভয় শব্দের ব্যবহার আল-কুরআনে পাওয়া যায়। লাত, মানাত, ওজ্জা, ওবল ইত্যাদি অলীক কল্পিত দেবতা হিসেবে স্বীকার করা ও তাদের মূর্তি বানিয়ে তার পুজা করা শিরকে আকবার।

ইয়াহূদীদের বাছুর পুজা এবং যিন্দিক ও পারসিকদের অগ্নিপূজাও শিরক। খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী তারাও মুশরিক। তাদের কেউ ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং God :he Father, God :he son and God :he holy Soul-এ তিন সত্তার স্বীকৃতি দেয়। তারাও শিরকে লিপ্ত।

কারো কারো বিশ্বাস যে, ভালো-মন্দ এ দুই বিপরীত গুণ একই সময়ে একই সত্তায় বিদ্যামান থাকতে পারে না। তাই তারা দুটি পৃথক সত্তার কল্পনা করে। একজন মঙ্গলের সত্তা এবং অপরজন মন্দের সত্তা। এভাবে দুই বিপারীত গুণ বিশিষ্ট দুই শক্তির উপাসনা করা শিরকে আকবার।

আবার এ বিশ্বের সৃষ্টি থেকে লয় পর্যন্ত পরিচালনার যাবতীয় কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব নয় বলে কোন কোন সম্প্রদায় মনে করে। তাদের বিশ্বাস এ বিশ্বের একজন স্রষ্টা, একজন পালনকর্তা এবং একজন সংহারকর্তা আছেন। আর এ তিন সত্তা হচ্ছে, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তারা এদের কল্পিত মূর্তি তৈরি করে পূজা করে। এ সবই শিরকে আকবার বা বড় ও প্রকাশ্য শিরক।

শিরকে আকবার বা প্রকাশ্য শিরক করার পরিণতি

শিরকে আকবার বা প্রকাশ্য শিরক করার পরিণতি সম্পর্কে কুরআনের দলীল প্রমাণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করবেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।" (সূরা আন-নিসা : ৪৮)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়।" (সূরা আল-আহকাফ : ৫)

وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না।" (সূরা আন-নিসা : ৩৬)

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

"আল্লাহ যে সব শস্য ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে এবং ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর জন্য এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য। যে অংশ তাদের দেবতাদের তা তো আল্লাহর দিকে পৌছে না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌছে যায়। তারা যা বিচার করে তা নিকৃষ্ট।" (সূরা আল-আনআম : ১৩৬)

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ

"আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে ডেকো না, যা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন করো তা হলে নিশ্চয় তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা ইউনুছ : ১০৬)

হাদীস দ্বারা দলীল প্রমাণ

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন :

من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী)

২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)।

খ. শিরকে আসগার (শিরকে খাফী) বা ছোট শিরক

যে সব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয়, সে সব কথা ও কাজই শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। যেমন: মাখলুকের (সৃষ্ট কিছুর) কোন বিষয়ের ব্যাপারে এমনভাবে সীমালংঘন করা, যা ইবাদাতের পর্যায়ে পৌঁছে না। ইবাদাতের পর্যায়ে পৌঁছলে তা শিরকে আকবারে পরিণত হবে। যেমন-

লোক দেখানো কাজ যা মানুষের জন্য করা হয়। ইবাদাতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি একাগ্রতা প্রদর্শন না করা। মানুষকে দেখানোর জন্য কোন ইবাদাত করা শিরকে আসগার। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার নামে কসম খাওয়া অথবা একথা বলা যে, 'আল্লাহর ইচ্ছায় এবং আপনার ইচ্ছায়' অথবা 'আল্লাহ এবং আপনি আমার জন্য যথেষ্ট, আপনার কারণে একাজ সাধিত হয়েছে ইত্যাদি শিরকে আসগার।

কখনো এ জাতীয় শিরক অবস্থাভেদে বক্তার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং বক্তার উদ্দেশ্যের কারণে শিরকে আকবারে পরিণত হয়।

রিয়া বা লোক দেখানো কাজ শিরকে খাফী বা শিরকে আসগার তথা ছোট শিরকের অন্তর্গত। রিয়া শব্দের অর্থ হল, লোক দেখানো ইবাদাত যা দ্বারা মানুষ তার নিজের কর্ম প্রদর্শন করে। আর এ ধরনের আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয় না। দুনিয়ার স্বার্থে লোক দেখানোই এ ধরনের ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য। যেমন নামাযে মুনাফিকদের অবস্থা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা নামাযে দাঁড়ালে খুবই অলসতা সহকারে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।" (সূরা আন-নিসা : ১৪২)

এ ধরনের খাটি ও প্রকৃত রিয়া কোন মুমিন ব্যক্তির রোযায় সংঘটিত হয় না। কিন্তু এ জাতীয় রিয়া বা লোক দেখানোর কাজ সংঘটিত হয় যাকাত, নামায ও হজ্ব আদায়কালে এবং এ আমলগুলো ব্যতীত অন্যান্য প্রকাশ্য আমলের ক্ষেত্রেও রিয়া সংঘটিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে একাগ্রতা খুবই দুর্লভ। তাই তারা এ আমলের কোন পুরস্কার আল্লাহর নিকট থেকে লাভ করবে না বরং তারা শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শিরকে আসগার -এর দলীল-প্রমাণ

হযরত রাসূল (সা) বলেন, "আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসটি সব চেয়ে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শিরক। তাঁকে ছোট শিরক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন: ছোট শিরক হচ্ছে রিয়া তথা লোক দেখানো কাজ।"

এধরনের শিরক মানুষের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যায়, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে শিরক মনে না হলেও প্রকৃত পক্ষে তা শিরকের অন্তর্গত। শিরকে আসগারের উদাহরণে বলা হয় যে, অন্ধকার রাত্রতে কালো মসৃণ পাথরের মধ্য দিয়ে যখন একটি ক্ষুদ্র কালো পিপীলিকা চলতে থাকে তা যেমন টের পাওয়া যায় না, শিরকে আসগার সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও তেমনি টের পাওয়া যায় না।

নামায আদায় করা, সিয়াম পালন করা এবং দান-খয়রাত করা ইসলামের বিধান। এটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করতে হয়। যখন নামায পড়া ও সিয়াম পালন করা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয় এবং

দান-খয়রাত করা লোক দেখানোর জন্য হয়, তখন এধরনের ইবাদাতের কোন গুরুত্ব থাকে না। আর আল্লাহ তা'আলাও এ ধরনের আমলের মুখাপেক্ষী নন। বান্দার এ কাজ তখন শিরকে পরিণত হয়।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায আদায় করলো, সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সিয়াম সাধনা করলো সে শিরক করলো এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান করলো সে শিরক করলো।" (মুসনাদ আহমদ)

শিরক গুরুতর অপরাধ। তাওবা বা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ পাপ মাফ হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। শিরক জঘন্য অপরাধ। সুতরাং সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

শিরকের কারণ

সর্বপ্রথম শিরক আরম্ভ হয় হযরত নূহ (আ)-এর উম্মতের মাঝে। তাদের কতিপয় সৎলোকের মৃত্যুর পর তাদের প্রতি অতি ভক্তির কারণে তাদের কবরে সিজদা আরম্ভ করে দেয়। আর এভাবে শিরকের বিস্তার ঘটে এবং যুগে যুগে এ শিরক ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। বর্তমানে পীর-পুরোহিতদের দরবারে মানত করা, তাদের মাজারে সিজদা করা সহ বিভিন্ন প্রকার শিরক কর্ম হযরত নূহ (আ)-এর উম্মতের শিরকের ধারাবাহিকতা মাত্র। এছাড়া মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যুগে যুগে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাওহীদের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়ছে। মানুষ আল্লাহর শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে আপাত মধুর প্রলোভনে অসংখ্য সৃষ্ট বস্তুর পূজা আরম্ভ করছে। আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নানা রকম কল্পিত দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে। তাদেরকে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে এবং উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমতুল্য হিসেবে বিশ্বাস করা হচ্ছে। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তারা নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ ভূলুণ্ঠিত করছে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কখনো আগুনের পূজা করছে, কখনো চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টিকর্তার মর্যাদায় বসাচ্ছে এবং সেগুলোর কাছে মাথা নত করছে। কখনো বা তারা শক্তিশালী কোন মানুষের পূজা করছে, এমন কি তারা বড় বড় জীব- জন্তু, বড় বড় বৃক্ষ-লতা, নদী-পাহাড় ইত্যাদির পূজা করছে। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা কল্পিত ধনের দেবতা, যশের দেবতা, বিদ্যার দেবতা ইত্যাদির মূর্তি বানিয়ে পূজা করেছে এবং বর্তমানেও করছে।

আবার কখনো আত্মগরিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে সরাসরি প্রভূ ও উপাস্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ বিভ্রান্তিতে মানব সমাজে সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব-কলহ, ফিতনা-ফ্যাসাদ। আল্লাহর বিধান ও জীবনব্যবস্থাকে ছেড়ে দিয়ে কোন ব্যক্তি রচিত বিধানের আনুগত্য করার ফলেও অগণিত লোক শিরকে লিপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। আর এভাবেই যুগে যুগে বিভ্রান্ত, বিপথগামী ও আত্মবিস্মৃত মানুষ এভাবে একত্ববাদের আকীদা থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানেও করছে। একত্ববাদ তথা তাওহীদের পরিবর্তে বণ্ডত্ববাদ, অংশীদারবাদ প্রভৃতিতে বিশ্বাসী হয়েছে। ফল স্বরূপ তারা ন্যায়-অন্যায় এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং ফেলছে।

মানবজাতিকে এহেন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর আনীত বিধানই মানবজাতির পার্থিব সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ আসমানী বিধান। আর এ বিধানের নাম হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আল-কুরআনের নির্দেশ মুতাবিক তিনি বাস্তব জীবন গঠন করে মানবসমাজের ইতিহাসে এক নযীরবিহীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। তিনি প্রচার করেছেন: আল্লাহর একত্ববাদ ভিত্তিক জীবন বিধান অনুযায়ী মানব জীবন পরিচালিত হলেই বলবৎ না থাকায় আল্লাহকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে তা পালন করা হচ্ছে না। আজ রুবুবিয়াতের তাওহদিকে মুলত অস্বীকার করা হচ্ছে। রব হিসেবে মেনে নেওয়া হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত আরো অনেক শক্তিকে। শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, বিশ্ব ব্যবস্থাপক এবং রব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃত বুজুর্গ ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনা করে।

বিশ্বের স্রষ্টা পালনকর্তা, সংহারকর্তা এবং শেষ বিচারে দিনের পুরস্কার ও শাস্তি দেয়ার মালিক এক আল্লাহ। তাঁর কোন অংশীদার থাকলে বা সমতুল্য থাকলে বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম শৃংখলায় ব্যাঘাত ঘটত। এক রাজ্যে একাধিক অধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে সে রাজ্যে শান্তি শৃংখলা ব্যহত হতে বাধ্য। পবিত্র

কুরআনে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলা হয়েছে :

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

"যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত বণ্ড ইলাহ থাকত, তবে উভয়ে ধংস হয়ে যেতো। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।" (সূরা আল আম্বিয়া : ২২)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন :

مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

"তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে কত পবিত্র!" (সূরা আল-মুমিনুন : ৯১)

আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা কল্পে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন :

قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا

"বল, আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাঁর পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা আল কাহ্‌ফ : ১১০)

এরূপ বণ্ড আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কীয় বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি ও তা যথানিয়মে পরিচালিত হওয়ার কলাকৌশলের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রসমূহের সৃষ্টি, এদের উদয় ও অস্ত, রাত দিনের পর্যায়ক্রম, আবহাওয়ার পরিবর্তন, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির ভাষা বর্ণ ও আকৃতির পার্থক্য এতসব বৈচিত্র্যের মধ্যে ও বিশ্ব চরাচর একটি অমোঘ নিয়মের আওতায় নিয়ন্ত্রিত। যে মহাশক্তি এ অমোঘ বিধানের নিয়ামক তিনি এক, অদ্বিতীয়, শরীকহীন ও অতুলনীয় সত্তা। এ হচ্ছে তাওহীদের মূলকথা আর এর বিপরীত হচ্ছে শিরক।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. সর্বপ্রথম যাঁর উম্মতের মাঝে শিরক আরম্ভ হয় তিনি হলেন-
   ক) হযরত আদম (আ);
   খ) হযরত মুহাম্মদ (স);
   গ) হযরত নূহ (আ);
   ঘ) হযরত ইবরাহীম (আ)।

২. শিরক আরম্ভ হয়-
   ক) সৎ লোকদের প্রতি অতি ভক্তির মাধ্যমে;
   খ) অগ্নি পূজার মাধ্যমে;
   গ) মানতের মাধ্যমে;
   ঘ) বণ্ডত্ববাদের মাধ্যমে।

৩. রিয়া হচ্ছে-
   ক) শিরক আকবর;
   খ) শিরক আসগর;
   গ) ছোট গুনাহ;
   ঘ) অমনোযোগী হওয়া।

৪. কারো কবরের উপর সিজদাহ করা-
   ক) বিদ্‌আত;
   খ) মাকরূহ;
   গ) হারাম;
   ঘ) শিরক।

৫. আল্লাহকে ভয় করার মতো অন্য কাউকে ভয় করা-
   ক) শিরকে আসগার;
   খ) বিদ্‌আত;
   গ) শিরকে আকবার;
   ঘ) মোবাহ।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. শিরক শব্দের অর্থ কী? শিরক বলতে কি বোঝায়? বর্ণনা করুন।
২. শিরক-এর কারণসমূহ আলোচনা করুন।
৩. একত্ববাদের পরিবর্তে কীভাবে বণ্ডত্ববাদের সৃষ্টি হয়েছে? লিখুন।
৪. শিরকে আকবার বলতে কী বুঝায়?
৫. শিরকে আকবারকারীর পরিণতি আলোচনা করুন।
৬. অপ্রকাশ্য বা ছোট শিরক উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. শিরক বলতে কী বুঝায়? কীভাবে শিরকের সৃষ্টি হয়? বিস্তারিত লিখুন।
২. শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৬

কুফর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কুফর-এর পরিচয় বলতে পারবেন;
- কুফরের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- কী কী কাজে কুফর হয় তা নির্ণয় করতে পারবেন;
- কুফরের পরিণতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

কুফর-এর পরিচয়

কুফর ঈমানের বিপরীত। কুফর হচ্ছে এক ধরনের মূর্খতা, শুধু মূর্খতাই নয় বরং সর্বাপেক্ষা বড় মূর্খতা। মানুষ আল্লাহকে না চিনে অজ্ঞ থাকলে তার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে? কুফর সবচেয়ে বড় যুলুম, আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামী এবং মারাত্মক পাপ। কুফরের অনিষ্ট পৃথিবীকে বিষায়িত ও দুর্বিষহ করে তোলে। সকল অনাচারের মূল উৎস হচ্ছে এ কুফর। সুতরাং কুফর হতে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।

'কুফর' শব্দের আভিধানিক অর্থ-

কোন কিছু ঢেকে রাখা, গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা ও অকৃতজ্ঞ হওয়া। ইসলামি পরিভাষায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। অনুরূপভাবে ইসলামি জীবনব্যবস্থার মৌল বিষয়াবলীকে অবিশ্বাস করাও কুফর। কাজেরই যে ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত তাকে 'কাফির' বলা হয়। কুফর, ঈমান ও ইসলামের আকীদা পরিপন্থী কাজ।

ইসলামী পরিভাষায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। অনুরূপভাবে ইসলামি জীবনব্যবস্থার মৌল বিষয়াবলীকে অবিশ্বাস করাও কুফর।

ব্যাপক সংজ্ঞা

تكذيب النبى صلى الله عليه وسلم فى شىء مما جاء به من الدين ضرورة كلا أوبعضا

"নবী করীম (স) কর্তৃক আনীত বিষয়াদি যা অকাট্যভাবে দীনের অঙ্গ বলে প্রমাণিত তার সবকিছু বা কোন একটি অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়।"

কাজেই আল্লাহ, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, তাকদীর, কিয়ামত, আখিরাত, হাশর, বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম এবং ইসলামের অন্যান্য গুকুম-আহকাম যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এসব অস্বীকার করা যেমন কুফরী, অনুরূপভাবে কোন একটি অস্বীকার করাও কুফরী।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, কুফর চার প্রকার:

১. কুফরে ইনকারী অর্থাৎ মুখে ও অন্তরে শরীআতকে অস্বীকার করা এবং সত্যকে বিশ্বাস না করা।
২. কুফরে জুহদ অর্থাৎ হক বা সত্যকে অন্তর দিয়ে সত্য জানা কিন্তু মুখে স্বীকার না করা।
৩. কুফরে ইনাদ অর্থাৎ সত্যকে সত্য জানা এবং মুখে তা স্বীকারও করা, তবে তা গ্রহণ না করা।
৪. কুফরে নিফাক অর্থাৎ মুখে সত্যকে স্বীকার করা কিন্তু অন্তরে তা অস্বীকার করা।

কুফর -এর পরিণতি

কুফর জঘন্য অপরাধ। তাই এর শাস্তিও কঠোর। কুরআন মজীদে এর ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ

রয়েছে। ঘোষিত হয়েছে :

فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّار يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

"যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা দিয়ে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার মগুর। যখনই তারা যন্ত্রণা কাতর হয়ে জাহান্নামে থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে আবার সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, দহন যন্ত্রণা আস্বাদ গ্রহণ কর।" (সূরা আল-হজ্জ : ১৯-২২)

অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে :

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। কাজেই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মদ : ৮-৯)

যারা কুফরী করে, শয়তান তাদের অভিভাবক এবং তারা হল জাহান্নামী। কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে :

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"আর যারা কুফরী করে তাগুত তাদের অভিভাবক, তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৫৭)

কুফরী কাজ ও কথা

আল্লাহ বা নবী- রাসূলকে গালি দেওয়া, তাঁদের প্রতি কটূক্তি করা অথবা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদি। নবী-রাসূলকে গালি দেওয়ার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন হুকুমকে (বিধান) খারাপ ও ত্রুটিপূর্ণ মনে করা, এ ত্রুটি-বিচ্যুতি তালাশ করা অথবা ফেরেশতাদের সম্পর্কে কটূক্তি করা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাও কুফরী।

আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও এমন কিছু বিশ্বাস, কথাবার্তা এবং কাজকর্ম রয়েছে যা কুফরীরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ বা নবী-রাসূলকে গালি দেওয়া তাঁদের প্রতি কটূক্তি করা অথবা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদি। নবী-রাসূলকে গালি দেওয়ার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স) উম্মাতের জন্য সুপারিশ করবেন, এটিকে অস্বীকার করাও কুফরী। ঈমান ও কুফরকে এক মনে করাও কুফরি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন হুকুমকে (বিধান) খারাপ ও ত্রুটিপূর্ণ মনে করা, এ ত্রুটি-বিচ্যুতি তালাশ করা অথবা ফেরেশতাদের সম্পর্কে কটূক্তি করা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাও কুফরী।

হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সর্বশেষ নবী হিসাবে বিশ্বাস না করা। অনুরূপ তাঁর পরে কোন নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস রাখাও কুফরী। নিজের ঈমান সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকা বা সন্দেহ পোষণ করাও কুফরী।

কারো মৃত্যুতে আল্লাহর উপর অভিযোগ আনা বা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করা বা এর কোন নির্দেশ সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা কুফরী।

কাউকে গুনাহের কাজ করতে দেখে কেউ যদি বলে, তুমি কি মুসলমান না? উত্তরে সে যদি বলে, আমি মুসলমান নই, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ তা'আলা বললেও আমি এ কাজ করব না' অথবা এরূপ বলে, 'জিব্রাঈল নেমে এসে বললেও আমি তার কথা মানব না' তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

কাফিরের কোন কাজ পছন্দ হওয়ার পর কেউ যদি আগ্রহ ব্যক্ত করে বলে, যদি কাফির হতাম তবে ভাল

হতো, তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। নামায সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করা, যেমন এ কথা বলা, আমার উপর নামায ফরয নয়, জ্ঞানীদের জন্য নামায পড়া ঠিক নয়, নামায আদায় করে লাভ কী? আমার অমুক আত্মীয় মরে গিয়েছে বা আমার ঐ সম্পদ ধংস হয়ে গিয়েছে আমার নামায পড়ে কি হবে ইত্যাদি বলা কুফরী। ইচ্ছাকৃতভাবে কেবলা ব্যতীত অন্যদিকে ফিরে নামায আদায় করা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা উযূতে নামায পড়া কুফরী। আযানের ধ্বনি সম্পর্কে কটুক্তিকরা কুফরী।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) -এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া, হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা) -এর খিলাফত অবৈধ মনে করা অথবা এরূপ আকীদা পোষণ করা যে, হযরত জিব্রাঈল (আ) ভুলক্রমে রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন, আসলে তাঁর ওহী নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল হযরত আলী (রা) -এর নিকট এসব আকীদা পোষণ কুফরী।

হালালকে হারাম জানা বা হারামকে হালাল জানা এবং তা প্রচার করাও কুফরী। হারাম বস্তু ভক্ষণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলাও কুফরী। অনুরূপভাবে কোন হারাম কর্মের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ে আরম্ভ করার একই বিধান।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভাল-মন্দের মালিক মনে করা, জ্যোতিষী বা গণকের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবরে বিশ্বাস করা, কারো সম্পর্কে এমন বিশ্বাস রাখা যে, তিনি গায়েবের খবর জানেন বা কোন কিছুই তার অজ্ঞাত নয় অথবা সে সকল বস্তু আল্লাহ ছাড়া কারো দেওয়ার ক্ষমতা নেই এমন বস্তু কেউ দিতে পারে বলে আকীদা পোষণ করা বা কারো কাছে তা চাওয়া কিংবা আল্লাহ ছাড়া কারো নামে পশু যবেহ করা কুফরী।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কা ভাল-মন্দের মালিক ম করা, জ্যোতিষী বা গ ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী বিশ্বাস করা, কারো স এমন বিশ্বাস রাখা যে গায়েবের খবর জানেন আল্লাহ ছাড়া কারো ন পশু যবেহ করা কুফরী

ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরী কথা উচ্চারণ করলে ঈমান চলে যায়। পূর্বে নামায, রোযা, হজ্জ, ইবাদাত-বন্দেগী যত কিছু করা হয়েছে সব বাতিল হয়ে যাবে। বিবাহ নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই তাওবা করে পুনরায় ঈমান গ্রহণ করতে হবে। এরপর বিবাহ নবায়ন করে নিতে হবে। আল্লাহ না করুন, কোন মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যায় তবে তাকে তিন দিনের সময় দিতে হবে। তার অন্তরে ইসলামের ব্যাপারে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে এর সমাধান দিতে হবে। এতে যদি তার বুঝ আসে এবং সে তাওবা করে মুসলামন হয়ে যায় তবে ভাল, নতুবা তিন দিন পরে তাকে হত্যা করা হবে।

কুফরের প্রকৃতি

কুফরের প্রকৃতি জঘন্য খারাপ। কেননা কাফির ব্যক্তি নিজে তার আপন স্বভাব-প্রকৃতির উপর অজ্ঞতার পর্দা ফেলেছে। সে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামি স্বভাব নিয়ে। তার গোটা দেহ, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে যাচ্ছে ইসলামি স্বভাবের উপর। আর সে তার বুদ্ধি-বিবেকের উপর পর্দা ফেলে স্বভাব-প্রকৃতির বিপরীত চলতে চায়। সুতরাং কাফির ব্যক্তি গভীর বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

কুফর হচ্ছে-সর্বাপেক্ষা বড় মূর্খতা। এজন্য কাফির ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তির পঙ্কে নিমজ্জিত। কুফর হচ্ছে, তার জীবন ও স্রষ্টার প্রতি সবচেয়ে বড় যুলুম। কেননা প্রকৃতির সকল কিছুই আল্লাহর বিধান মেনে নিচ্ছে, কিন্তু কাফির ব্যক্তি তা না মেনে নিজের জীবনের উপর যুলুম করছে।

কুফর হচ্ছে, মহান আল্লাহর সাথে চরম বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামী। কেননা আল্লাহর দেওয়া সবকিছু ভোগ ব্যবহার করে তাঁরই বিধান অমান্য ও অস্বীকার করা জঘন্য অপরাধ, নিকৃষ্টতম কাজ।

কূফর একটি মারাত্মক, ধংসাত্মক ও গুরুতর অপরাধ এবং মহাপাপ। কাফির ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং গোপন করে বলে সে রাজদ্রোহীর শামিল। সে আল্লাহর চরম অকৃতজ্ঞ ও নিকৃষ্টতম বিদ্রোহী। সকল অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়ের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এ কুফর। সুতরাং কুফর একটি ধংসাত্মক জঘন্যতম মহাপাপ।

কুফর যে মহাপাপ এটা দিবালোকের মতই ভাস্বর। আমাদেরকে কুফরী কাজ হতে সতর্ক থাকতে হবে। আর পৃথিবী হতে যাবতীয় কুফরী ও খোদাদ্রোহিতা নির্মূল করতে হবে। নির্ভেজাল তাওহীদ তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার আপ্রাণ প্রয়াস চালাতে হবে। তা হলেই মানব জন্ম সার্থক ও সুন্দর হবে ইহ ও পরকালে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কুফর শব্দের অর্থ-
   ক) গোপন করা;
   খ) অকৃতজ্ঞ হওয়া;
   গ) অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা;
   ঘ) সব উত্তরই সঠিক।

২. নবী করীম (স) কর্তৃক আনীত বিষয়াদির সবকিছু বা কোন একটি অস্বীকার করাকে বলে-
   ক) শিরক;
   খ) কুফর;
   গ) নিফাক;
   ঘ) বিদ্‌আত।

৩. মুখে ও অন্তরে শরীয়ত অস্বীকার করাকে বলে-
   ক) কুফরে ইনকারী;
   খ) কুফরে জুহদ;
   গ) কুফরে ইনাদ;
   ঘ) কুফরে নিফাক।

৪. আযানের ধনি সম্পর্কে কটুক্তি করলে-
   ক) ঈমান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়;
   খ) শিরক হয়;
   গ) মুনাফিকির লক্ষণ;
   ঘ) কুফরী।

৫. আল্লাহর বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা-
   ক) ত্রুটিপূর্ণ কাজ;
   খ) কুফরী।
   গ) এতে ঈমানের ক্ষতি হয়;
   ঘ) মাকরূহ;

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুফর শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. কুফর-এর ব্যাপক সংজ্ঞাটি লিখুন।
৩. কুফর কত প্রকার ও কী কী? পরিচয়সহ লিখুন।
৪. কুফর -এর পরিণতি দলীল-প্রমাণসহ লিখুন।
৫. কুফরী কাজ ও কথাবার্তাগুলো বর্ণনা করুন।
৬. কুফর-এর প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কুফর ও কাফির -এর পরিচয়, কুফর -এর প্রকারভেদ এবং কুফরী কাজ ও কথাবার্তাগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

পাঠ-৭

নিফাক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নিফাক-এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- মুনাফিকের শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুনাফিকের আলামতসমূহ লিখতে পারবেন;
- মুনাফিকের পরিণতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কোন মুমিনের মধ্যে নিফাকের কোন চিহ্ন পাওয়া গেলে তার শুকুম কি তা লিখতে পারবেন।

নিফাক

নিফাক একটি অতি ঘৃণ্য পাপ। কারণ মুনাফিক বাহ্যত ইসলামের কাজ করে এবং মুসলিমদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করে নিজকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে এবং আর্থসামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। পক্ষান্তরে সে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও তাঁর প্রতি অবাধ্যতা গোপন রাখে এবং ইসলামের শত্রুদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে এবং মুসলিম সমাজের ক্ষতি করে। এদিক থেকে মুনাফিক কাফির, এমনকি কাফিরের চেয়েও খারাপ। কেননা মানুষ প্রকাশ্য শত্রু থেকে সচেতন হতে পারে, কারণ তারা মুখ চেনা শত্রু। কিন্তু গোপন শত্রু থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর। এরা সব সময় মুসলমানদের জব্দ করার জন্য সচেষ্ট থাকে। গোপনে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলিম সমাজের ক্ষতি সাধন করে।

এ সকল কাজ-কর্ম তাওহীদের পরিপন্থী। যারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়াতের বিশ্বাস করে, পরকালের শান্তি ও শাস্তি অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস করে তারা কখনো কপট হতে পারে না। তারা মুখে এক ও অন্তরে ভিন্নতা পোষণ করতে পারে না। তাওহীদ পন্থীরা এ ধরণের কপট ও বিশ্বাসঘাতকদের থেকে সব সময়ই সতর্ক থাকেন।

নিফাক শব্দের অর্থ

নিফাক আরবি অর্থ। এর অর্থ হচ্ছে, কপটতা অর্থাৎ মুখে এক কথা বলা এবং অন্তরে ভিন্নমত পোষণ করা। যারা এরূপ করে তাদেরকে মুনাফিক বা কপট বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় মুনাফিক ঐ সব লোককে বলা হয় যারা মুখে মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে কিন্তু অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ পোষণ করে।

ইসলামী পরিভাষায় মু
ঐ সব লোককে বলা
যারা মুখে মুখে আল্লা
প্রতি ঈমান আনে কি
অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস
বিদ্বেষ পোষণ করে।

নিফাক শব্দের প্রায়োগিক অর্থ

নিফাক শব্দের প্রায়োগিক অর্থ হল, বাইরে প্রকাশিত বিষয় অন্তরে লুকায়িত বিষয়ের বিপরীত। অর্থাৎ অন্তরে এক রকম পোষণ করা এবং বাইরে অন্য রকম প্রকাশ করা। অন্তরে বিরোধিতা গোপন করে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করা। অর্থাৎ অন্তরে কুফরী গোপন রেখে বাইরে মুখে মুখে ঈমানের কথা বলা বা স্বীকার করা এবং লোক দেখানো অনুষ্ঠানাদি পালন করা। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে মুনাফিক বা কপট বলা হয়।

মুনাফিকদের শ্রেণী বিভাগ

মুনাফিক দুইভাগে বিভক্ত

আকীদা-বিশ্বাসগত ও আমলের দিক থেকে বিবেচনা করে মুনাফিককে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. **আকীদা ও বিশ্বাসগত মুনাফিক :** অন্তরের সাথে যাদের বাইরের গরমিল বা বাইরের সাথে অন্তরের গরমিল। যথা-যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখে তাদেরকে

আকীদাগত মুনাফিক বলে।

২. **আমল বা কর্মের দিক থেকে মুনাফিক :** এ শ্রেণীর মুনাফিকরা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে প্রকৃত মুমিন হতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পার্থিব স্বার্থে তারা এ উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকে। আর এটা হচ্ছে আমলের বা কর্মের নিফাক।

আমলগত মুনাফিকের আলামত

হাদীস শরীফে মুনাফিকের চারটি আলামত বর্ণনা করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে-নবী (স) বলেন-

عن عبد الله بن عمروقال : قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منا فقا خا لصا . ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يد عها إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف وإذا خا صم فجر و إذا عاهد غدر .

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন: চারটি দোষ বা আলামত যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে প্রকৃত মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি দোষ বা আলামত থাকবে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বাভাব থেকে যাবে। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোন ওয়াদা বা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে, যখন ঝগড়া করে অশ্লীল গালিগালাজ করে, আর যখন চুক্তি করে তা পরিপূর্ণ করে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক হাদীস দ্বারা মুনাফিকদের তিনটি আলামতের কথা বলা হয়েছে, হাদীসটি এরূপ:

عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أية المنا فق ثلاث : إذا حدث كذب، واذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان .

"হযরত আবু গুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে; যখন সে ওয়াদা করে বা অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে তা আত্মসাৎ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রথম হাদীসে মুনাফিকের আলামত চারটি এবং দ্বিতীয় হাদীসে তিনটি আলামত উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে তিনটি অপর হাদীসে চারটি আলামত বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রয়োজনের কারণে বর্ণনার তারতম্য হয়েছে। অথবা যার মধ্যে চারটি চিহ্ন পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক আর যার মধ্যে তিনিটি চিহ্নি পাওয়া যাবে সে তুলনামূলক হালকা মুনাফিক।

দা ও বিশ্বাসগত দিক ক মুনাফিক, বাইরের সাথে যাদের অন্তরের । মুখে যারা ঈমানের কথা বলে আর অন্তরে ী পোষণ করে। লোক দেখানোর জন্য তারা ামী অনুষ্ঠানাদি পালন করে পক্ষান্তরে গোপনে সলিম সমাজকে ধ্বংস র ষড়যন্ত্র করে। তারা র ভয়ানক। তাদের এ ফাক অত্যন্ত জঘন্য ও অপরাধ এবং মারাত্মক ব্যাধি।

প্রথম প্রকার মুনাফিক আকীদাগত মুনাফিক

আকীদা ও বিশ্বাস গত দিক থেকে মুনাফিক হল বাইরের সাথে যাদের অন্তরের গরমিল। মুখে যারা ঈমানের কথা বলে আর অন্তরে কুফরী পোষণ করে। লোক দেখানোর জন্য তারা ইসলামি অনুষ্ঠানাদি পালন করে পক্ষান্তরে গোপনে মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করে। তারা খুব ভয়ানক, তাদের এ নিফাক অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণ্য অপরাধ এবং মারাত্মক ব্যাধি। আর এ ধরণের নিফাক আল্লাহর কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের নিফাককে নিফাকে আকবার বা সবচেয়ে বড় নিফাক বলা হয়, যা কুফরী থেকেও মারাত্মক। কেননা, এ জাতীয় মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার উপর ফেরেশতাদের উপর, আসমানী কিতাবের উপর এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উপর প্রকাশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে আর অন্তরে কুফরী করে। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে কাফির ও মুশরিকরা রাসূল (স) ও নব মুসলিমদের নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে ও প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের গুপ্তচর বৃত্তি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বার বার মুসলিমদেরকে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

"আর মানুষের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়।" (সূরা আল-বাকারা : ৮)

এদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেছেন :

وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قَالُوَا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوَاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

"আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি, আমরা তো মুসলমানদের সাথে উপহাস করছি মাত্র।" (সূরা আল-বাকারা : ১৪)

মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্যই তারা এরূপ করত। মুনাফিকদের এ ধরনের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির নিন্দাবাদ করেই উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। মুনাফিকরা মনে করতো যে তারা এভাবে মুসলমানদের সাথে উপহাস করে চলবে এবং বোকা বানাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপহাস ও ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন যে, তারাই উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র হয়েছে।

আকীদাগত মুনাফিকদের পরিণাম

এ প্রকার মুনাফিকরা পরকালে কাফিরদের সাথে এক ও অভিন্ন শাস্তি ভোগ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعاً

"নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফির সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন।" (সূরা আন-নিসা : ১৪০)

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (স)-কে আদেশ দিয়ে ঘোষণা করেছেন।

يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"হে নবী! কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো ও তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করো। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম আর তা হল নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।" (সূরা আত-তাওবা : ৭৩)

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধে আরো ঘোষণা করেছেন:

إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে।" (সূরা আন-নিসা : ১৪৫)

মুনাফিকদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَعَدَ الله ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের, তাতে তারা স্থায়ী হবে। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। আর

তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।" (সূরা আত-তাওবা : ৬৮)

মুনাফিকদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত: পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।" (সূরা আত-তাওবা : ৮৪)

তাদের সম্পর্কে আরো কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা :

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ

"তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা; তুমি সত্তরবার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।" (সূরা আত-তাওবা: ৮০)

দ্বিতীয় প্রকারের নিফাক

যে নিফাক আমল বা কর্মের দিক থেকে (আমলগত নিফাক) সংঘটিত হয় তাকে নিফাকে আসগার বা ছোট নিফাক বলা হয়। এ ধরনের নিফাককারীরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস করে এবং ইবাদাতে একাগ্রতা প্রকাশ করে কিন্তু কতিপয় কবীরা গুণাহ করে থাকে যা মুনাফিকের আলামত সম্বলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ ধরণের মুনাফিকগণ সম্পূর্ণভাবে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না, কিন্তু তারা এমন পথ অবলম্বন করে যা তাদেরকে নিফাকে আকবার বা কুফরের দিকে ধাবিত করে এবং তাদের দ্বারা পাপ কার্য হতে থাকে। এ জাতীয় নিফাক মুনাফিকদের সেই ঘৃণ্য আলামতের দিকেই একজন মানুষকে টেনে নিয়ে যায় যার মধ্যে রয়েছে মিথ্যা বলা। আর মিথ্যা বলা কাবীরা গুনাহ।

নিফাকের দ্বিতীয় আলামত হল, যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে। অর্থাৎ যখন তার কাছে কোন ধনসম্পদ বা কোন হক অথবা কোন গোপনীয় বিষয় আমানত রাখা হয়, তখন সেটা নষ্ট করে দেয় এবং তার সংরক্ষণ করে না। এটা কোন মতেই কাম্য নয়।

মুনাফিকের তৃতীয় আলামত হল, যখন সে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে। চুক্তি আল্লাহর সাথেও হতে পারে অথবা অপর কোন মানুষের সাথেও হতে পারে বা অন্য কোন সৃষ্টির সাথেও হতে পারে। তখন সে চুক্তি পূর্ণ করে না। অথচ তা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

"তোমরা চুক্তি পূর্ণ কর। নিশ্চয় চুক্তির বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা বনী-ইসরাঈল : ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ

"তোমরা আল্লাহর সাথে তোমাদের চুক্তি পূর্ণ কর, যখন তোমরা চুক্তি কর।" (সূরা আন-নাহল : ৯১)

চুক্তি ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ। যদি কাফিরের সাথেও চুক্তি হয় তবুও তা পূর্ণ করতে হবে। চুক্তির ব্যাপারে কোন অসম্পূর্ণতা বৈধ নয়।

মুনাফিকের চতুর্থ আলামত বা স্বভাব হচ্ছে : যখন ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীলতা প্রদর্শন করে।

যে ব্যক্তির মধ্যে মুনাফিকদের চারটি স্বভাব প্রতিফলিত হবে (কথা-বার্তায় মিথ্যা বলা, আমানতের খিয়ানত করা, চুক্তি ভঙ্গ করা, ঝগড়ায় লিপ্ত হলে অশ্লীলতা প্রদর্শন করা) তা হলে সে প্রকৃত আমলী মুনাফিক হয়ে যাবে, তবে কাফির হবে না। আর যদি কারো মধ্যে এ চারটি স্বভাবের যে কোন একটি স্বভাব পাওয়া যায়, সে মুমিন থাকবে, তাকে কাফির বলা যাবে না। এ ধরনের মুনাফিককে তাওবা করে সংশোধন হতে হবে। তারা আজীবন জাহান্নামে থাকবে না। তাদেরকে মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ ধরনের নিফাক থেকে পূর্ববর্তী আলিমগণ এজন্য সতর্ক করেছেন যে, এটি মানুষকে আকীদাগত নিফাকের দিকে ধাবিত করে। তাই নবী (স) এগুলোকে মুনাফিকী স্বভাব বলেছেন।

মুমিনের মধ্যে নিফাকে আমলী প্রকাশিত হলে তার শুকুম

কোন মুমিনের মধ্যে নিফাকের নির্দশন পাওয়া গেলে তার হুকুম কী এ নিয়ে ইসলামি পণ্ডিতগণ মতভেদ করেছেন

১. কেউ কেউ, নবী করীম (স) এর এ উক্তি–

من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه من النفاق .

"যার মধ্যে নিফাকের কোন একটি নির্দশন পাওয়া যাবে তার মধ্যে ততটুকু নিফাক থাকবে।" প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে যদি কুফর বা নিফাকের নির্দশন পাওয়া যায় তবে সে ঈমান হতে সম্পূর্ণ খারিজ হবে না।

২. ইমান খাত্তাবীর (র) মতে, হাদীসে বর্ণিত স্বভাবগুলো যার মধ্যে পাওয়া যায় সে মুনাফিক হয়ে যাবে-এ উক্তি দ্বারা নবী করীম (স) মুমিনদের নিফাকী স্বভাব থেকে সতর্ক করেছেন। বস্তুত সে প্রকৃত মুনাফিক হবে না। যেমন: নামায না পড়া হতে সতর্ক করার জন্য فقد كفر সে কুফুরী করেছে বলে সতর্ক করা হয়েছে। মুলত সে কাফির হবে না।

৩. ইমাম নববীর মতে বর্ণিত স্বভাবগুলো কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে রূপক অর্থে মুনাফিক হবে, বাস্তব অর্থে মুনাফিক হবে না।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আকীদাগত নিফাকের শুকুম কী?
   ক) বিদ্‌আত;
   খ) পাপ;
   গ) কুফরী;
   ঘ) জঘন্য অপরাধ।

২. নিফাক শব্দের অর্থ হচ্ছে-
   ক) মুখে এক অন্তরে তার বিপরীত;
   খ) মুখে এবং অন্তরে একই চিন্তা করা;
   গ) কাজ-কর্মে বিদ্‌আত প্রদর্শন করা;
   ঘ) উপরের কোনটিই ঠিক নয়।

৩. খাঁটি মুনাফিকের আলামত ক'টি?
   ক) ৪টি;
   খ) ৫টি;
   গ) ৩ টি;
   ঘ) ২টি।

৪. আমলগত মুনাফিকদের শুকুম কী?
   ক) ফাসিক;
   খ) কাফির;
   গ) পৌত্তলিক;
   ঘ) মুশরিক।

৫. আকীদাগত মুনাফিকদের মৃত্যু হয়?
   ক) ঈমানের সাথে;
   খ) নাফরমানীর সাথে;
   গ) কুফরীর সাথে;
   ঘ) শিরকের সাথে।

৬. চুক্তি ভঙ্গ করা
   ক) সামাজিক অপরাধ;
   খ) অবৈধ এবং হারাম;
   গ) মুনাফিকের আলামত;
   ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. নিফাক -এর শাব্দিক, পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থ লিখুন।
২. মুনাফিকের শ্রেণী বিভাগসহ প্রত্যেক শ্রেণীর সংজ্ঞা উল্লেখ করুন।
৩. মুনাফিকের আলামত ক'টি ও কী কী? হাদীসের আলোকে বর্ণনা করুন।
৪. আকীদা ও বিশ্বাসগত দিক থেকে মুনাফিক বলতে কী বুঝায়? এ প্রকার মুনাফিকের পরিণতি বর্ণনা করুন।
৫. নিফাকে আসগার বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
৬. মুনাফিকের তৃতীয় আলামত কী? লিখুন।
৭. মুমিনের মধ্যে আমলগত নিফাক প্রকাশ পেলে তার শুকুম কী? বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নিফাক কী? নিফাক কতপ্রকার ও কী কী? এর পরিণাম কী? মুনাফিকের আলামতসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-৮

বিদআত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- তাওহীদ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- তাওহীদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিদ্আত-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- বিদ্আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিদ্আত যে নিন্দনীয় কাজ তা প্রমাণ করতে পারবেন।

বিদ্আত তাওহীদের-এর পরিপন্থী। বিদ্আতকে জানতে হলে প্রথমত তাওহীদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাওহীদ জানা না থাকলে বিদ্আতী কাজ কর্ম সম্পর্কে আকীদা পোষণ করা কঠিন। তাই এখানে প্রথমে তাওহীদ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

তাওহীদ

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করাকে তাওহীদ বলে। রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে এক এবং অদ্বিতীয় জানা এবং বিশ্বাস করা। তিনিই একমাত্র মালিক, তিনিই প্রতিপালনকারী। তিনি জীবন ও মৃত্যুদাতা। এক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। তিনি ইবাদাতের জন্য একমাত্র প্রকৃত ইলাহ বা উপাস্য। তিনি ছাড়া আর যে সকল ইলাহকে মানুষ উপাসনা করে তা বাতিল এবং ভ্রান্ত। তাঁর সাথে অন্য কাউকে ইলাহরূপে স্বীকৃতি দেয়া শিরক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র নামসমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একক এবং অদ্বিতীয়। যে সকল নাম আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট তা কোন মানুষ ধারণ করতে পারে না। যেমন: আল্লাহ তা'আলার নাম রাজ্জাক বা রিযিকদাতা। এটা আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম। এ নামের সাথে কোন মাখলুক সমকক্ষ দাবি করতে পারে না এবং নিজকে রাযযাক হিসেবে নামকরণ করতে পারে না। বরং সে আব্দুর রায্যাক হিসেবে অর্থাৎ রিযিকদাতার দাস হিসেবে নাম ধারণ করতে পারবে। যদি কেউ রায্যাক নাম ধারণ করে, তবে সে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করলো, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে এ কথারও স্বীকৃতি দিতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দা ও রাসূলের প্রতি যে শরীআত প্রেরণ করেছেন, তার মধ্যে ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন কিছু নতুন সংযোজন করা যাবে না। কারণ ইসলামি শরীআত একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যার মধ্যে সব কিছুর বিধান দেয়া হয়েছে। সুতরাং কোন কিছু সংযোজন যেমন বৈধ নয়, তেমনি কোন কিছু বিয়োজন করাও বৈধ নয়। তেমনিভাবে কোন কোন আমলের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে কোন কোন আমলের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা এবং সংক্ষিপ্ত করাও নিষিদ্ধ। ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে আমল যেভাবে করার বিধান রয়েছে, তা সঠিক ও নির্দিষ্টভাবে সম্পাদন করাই তাওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তাওহীদের গুরুত্ব

তাওহীদ আল্লাহর একত্ববাদের প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে সকল শিরক ও বিদ্আতকে ধ্বংস করে। তাওহীদবাদীরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। তাওহীদ পৃথিবীতে সকল কল্যাণের আধার। তাওহীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন বিলোপ সাধিত হয়। তাওহীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে, মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ

জন্মে। মানুষ ফেরেশতা বা মালাইকা থেকেও উর্ধ্বে আরোহণ করে। তাওহীদের কারণে মানুষ জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে চির সুখী হয়। সকল ইবদাত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করার মূল চাবিকাঠি হলো তাওহীদ। তাওহীদ সকল ইবাদাতের মূল। প্রতিটি মানব তথা মুসলামনের জন্য তাওহীদ শিক্ষা করা, তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ফরয।

বিদ্আত

ইসলামে বিদ্আত হচ্ছে এমন কাজ যার প্রতি শরীআত সমর্থিত কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। বিদ্আত ইসলামের মধ্যে ইবাদাতের নামে এক নতুন সংযোজন। ইসলাম বিদ্আতকে কখনো স্বীকৃতি দেয় না। যারা ইসলাম ধর্মের মধ্যে কুরআন হাদীস বর্জিত নতুন কোন কাজ ইবাদাতের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে তা গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিন্দনীয়।

বিদ্আত অর্থ

ইমাম রাগিব (র) বিদ্আতের অর্থ করেছেন এভাবে-কোনরূপ পূর্ব নমুনা বা মডেলের অনুকরণ অনুসরণ না করেই কোন কিছু নতুনভাবে সৃষ্টি করা। (মুফরাদাত)

মাযহাবের ক্ষেত্রে বিদ্আতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম রাগিব বলেছেন :

والبد عة فى المذا هب إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة أماثلها المتقدمة وأصولها المتقننة.

"মাযহাবের ক্ষেত্রে বিদ্আত হচ্ছে এমন কোন কথা উপস্থাপন করা যার প্রবক্তা ও অনুসারী শরীআত প্রবর্তক বা প্রচারক কর্তৃক প্রচারিত শরীআতের মৌলনীতি ও সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন আদর্শের অনুকরণ অনুসরণ করেন না।" অর্থাৎ শরীআত প্রবর্তক যে কথা বলেননি, সে কথা বলা এবং তিনি যা করেননি, এমন কাজকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করাই হচ্ছে বিদ্আত।

ইমাম নববী বিদ্আত শব্দের অর্থ লিখেছেন এভাবে-

البد عة كل شئ وعمل على غير مثال سا بق.

"বিদ্আত হল এমন কাজ যার পূর্ব কোন দৃষ্টান্ত নেই।"

মুল্লা আলী কারীর মতে, শরীয়াতের পরিভাষায় বিদ্আত হল :

إحدات ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

"রাসূলের যুগে ছিল না এমন নীতি ও পথকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রবর্তন করা।"

ইমাম শাতেবীর মতে :

يقا ل ابتدع فلان بدعة يعنى ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق .

"আরবি ভাষায় বলা হয় অমুক ব্যক্তি বিদ্আত করেছে। এর অর্থ হল, অমুক লোক নতুন পন্থার উদ্ভাবন করেছে, ইত:পূর্বে যার কোন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়নি।"

আর এ জন্যই নবোদ্ভাবিত কাজকেই বিদ্আত বলা হয় এবং অনুসরণের জন্য নতুন পন্থা বের করাকে ابتداع (ইবতেদা) বলা হয়। আর এর ফলে যে কাজটি সংঘটিত হয় তাকে বলা হয় বিদ্আত।

তিনি আরো বলেন :

ولا معنى للبد عة إلا أن يكون الفعل فى اعتقاد المبتدع شرعا وليس بمشروع.

"বিদ্আত তখনই বলা হবে, যখন বিদ্আতী কোন কাজকে শরীআত মোতাবেক কাজ বলে মনে করবে

অথচ তা মূলত শরীআত মোতাবেক নয়।"

অর্থাৎ শরীআত মোতাবিক নয় এমন কাজকে শরীআত মোতাবিক কাজ বলে আকীদা হিসেবে বিশ্বাস করে নেয়াই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বিদ্আত। তিনি আরো বলেন:

فمن هذا المعنى سمى العمل الذى لا دليل عليه فى الشرع بدعة .

"এ কারণেই এমন কাজকেও বিদ্আত বলা হয়েছে, যে কাজের সমর্থনে শরীআতের কোন দলীল বা প্রমাণ নেই।" সুতরাং বিদ্আত হল-

فالبدعة إذن عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبا لغة فى التعبد لله سبحا نه

"মোটকথা হচ্ছে, বিদ্আত বলা হয় দীন ইসলামে বাহ্যিকভাবে এমন কর্মনীতি বা কর্মপন্থা চালু করা যা শরীআতের অনুরূপ এবং যা করে আল্লাহর বন্দেগীর ব্যাপারে আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি করাই লক্ষ্য হয়।" (আল-ইতিসাম)

তিনি আরো বলেন, প্রকৃত ও সত্যিকারের বিদ্আত তাই, যার স্বপক্ষে ও সমর্থনে শরীআতের কোন দলীল নেই। না আল্লাহর কিতাবে, না রাসুলের হাদীসে, না ইজমাতে, না এমন কোন দলীল পেশ করা যায় যা বিজ্ঞজনের নিকট গ্রহণযোগ্য। না মোটামোটিভাবে, না বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিভাবে। এ জন্য এর নাম দেয়া হয়েছে বিদ্আত। কেননা তা মনগড়া স্বকল্পিত, শরীআতে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। সুন্নাতের পরিপন্থী কাজই বিদ্আত এবং নিন্দনীয়।

বিদ্আতের প্রকারভেদ

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে বিদ্আত দু'প্রকার। বিদ্আত হাসানা বা উত্তম বিদ্আত ২. বিদ্আত মুসতাকবাহা অর্থাৎ ঘৃণিত ও জঘন্য বিদ্আত।

বিদ্আত যদি কোন শরীআত সম্মত ভালোকাজের মধ্যে গণ্য হয় তবে তা বিদ্আত হাসানাহ। আর যদি তা শরীআতের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘন্য কাজের মধ্যে হয় তবে তা বিদ্আতে মুসতাকবাহা ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদ্আত।

বিদ্আতের এই শ্রেণীবিভাগ করাও একটি বিদ্আত বলে কেউ কেউ মনে করেন। কারণ বিদ্আতকে ভালো ও মন্দ এ দু'ভাগে ভাগ করার ফলে বণ্ড সংখ্যক বিদ্আতই ভালো বিদ্আত হওয়ার সমর্থন নিয়ে ইসলামি আকীদা ও আমলের বিশাল ব্যবস্থায় আগোচরে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে তাওহীদবাদীরাই আজ এমন সব কাজ অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে, যা প্রকৃত পক্ষেই তাওহীদ বিরোধী যা সুস্পষ্টরূপে বিদ্আত এবং কোন তাওহীদবাদীর পক্ষেই তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা ইমাম শাওকানী বলেছেন, যাই সুন্নাতের বিপরীত তাই বিদ্আত। অতএব বিদ্আতের সব কিছুই নিন্দনীয়, পরিত্যাজ্য। যার মধ্যে কোন দিকই প্রশংসনীয় বা ভালো হতে পারে না। অন্য কথায়, বিদ্আতকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগকে ভালো বলে আখ্যায়িত করা এবং অপর ভাগকে মন্দ বিদ্আত বলা একেবারেই অমূলক।

ইসলামি শরীআতে যার ভিত্তি বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, তা কোন ক্রমেই সুন্নাতের বিপরীত হতে পারে না। কাজেই যা সুন্নাতের বিপরীত নয়, তা বিদ্আতও নয়। আর যার কোন দৃষ্টান্তই ইসলামের সোনালী যুগে পাওয়া যায় না, শরীআতে পাওয়া যায় না, যার কোন ভিত্তি নেই তা কোন ক্রমেই শরীআত সম্মত নয় বরং তাই সুন্নাতের বিপরীত এবং তাই বিদ্আত। এর কোন দিকই ভালো প্রশংসনীয় বা গ্রহণযোগ্য নয়। এক কথায় বিদ্আতকে ভালো ও মন্দ এ দু'ভাগে ভাগ করা অযৌক্তিক। হযরত উমার (রা) এর উক্তি نعمت البد عة (কতই না সুন্দর বিদ্আত) দ্বারা কেউ কেউ বিদ্আতে হাসানা এর প্রমাণ গ্রহণ করে থাকে। মূলত হযরত উমারের (রা) উক্তিতে উল্লিখিত বিদ্আত শব্দটি

শাব্দিক অর্থে বিদ্‌আত। শরীআতের পারিভাষিক অর্থে বিদ্‌আত নয়।

শুকুমের দিক থেকে বিদ্‌আতের প্রকারভেদ

বিদ্‌আতের ঘৃণ্যতা ও জঘন্যতার দিকে লক্ষ্য করে তাওহীদবাদীগণ বিদ্‌আতকে বিভিন্নভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১. **কাফির পরিণতকারী বিদ্‌আত :** শরীআতের কোন বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে তার স্থলে নিজের মনগড়া কিছু চালু করা।

২. **অবৈধ বা হারামকৃত বিদ্‌আত :** যেমন মৃতদেরকে মাধ্যম বানিয়ে ওসীলা গ্রহণ করা, কবর মুখী হয়ে নামায আদায় করা এবং তার জন্য নযর মানা, তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা আর কবরের উপর সৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করা।

৩. **মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিদ্‌আত :** যেমন- জুমআর নামাযের পর যোহরের নামায আদায় করা, আযানের পূর্বে উচ্চঃস্বরে দরুদ ও সালাম পাঠ করা ইত্যাদি।

এ সকল বিদ্‌আত থেকে প্রতিটি মুসলমান নর-নারীকে বেঁচে থাকতে হবে। কোন আমল করার পূর্বে বিচার করতে হবে তা সুন্নাতের-বিপরীত কিনা। কারণ আপাত দৃষ্টিতে তা অনেক ভাল দেখালেও শরীআতে তার কোন মূল্য নেই।

বিদ্‌আত নিন্দনীয় হওয়ার প্রমাণ

মহানবী (স) বিদ্‌আত সম্পর্কে শুশিয়ার করে ঘোষণা করেছেন :

إيا كم و محد ثات الأمور فإن كل محد ثة بد عة و كل بد عة ضلا لة .

"তোমরা নিজেদেরকে ধর্মের মধ্যে নব উদ্ভাবিত বিষয়াদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কেননা ধর্মের মধ্যে প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত জিনিসই বিদ্‌আত আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।"

এ হাদীসে বর্ণিত শব্দ 'মুহদাসাতুল উমুর'-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আহমাদুল বান্না (র) বলেন,

মুহদাসাতুল উমুর বুঝায় এমন জিনিস ও বিষয়াদিকে যা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা অর্থাৎ কোন দিক দিয়েই শরীআতে বিধিবদ্ধ নয়। আর এই হচ্ছে বিদ্‌আত।

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন :

من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد .

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যার অনুকুলে ও সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই, (অর্থাৎ যা শরীআত মোতাবেক নয়) তা প্রত্যাখ্যাত।"

রাসূল (স) থেকে আরো বর্ণিত আছে :

فإن خيرا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محد ثا تها وكل بدعة ضلالة

"জেনে রেখো, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম কর্মবিধান হচ্ছে মুহাম্মদ (স)-এর উপস্থাপিত জীবন বিধান। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম জিনিস হচ্ছে নবোদ্ভাবিত মতাদর্শ আর প্রত্যেক নবোদ্ভাবিত মতাদর্শ সুস্পষ্ট গোমরাহী।" (মুসলিম)

এ হাদীসে বর্নিত محدثانها শব্দটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (র) বলেন :

المحدثات يعنى البدع الاعتقادية والقولية و الفعلية .

"মুহদাসাত বলতে বুঝায় সে সব বিদ্আত, যা আকীদা, কথা-বার্তা এবং আমলের ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবিত।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "শিরক তাওহীদের পরিপন্থী আর বিদ্আত সুন্নাতের বিপরীত। শিরক হলো, 'লা ইলাহা ইল্লালাহ' কালেমার এই প্রথম অংশের অস্বীকৃতি। আর বিদ্আত হচ্ছে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কালেমার এই শেষাংশের বিপরীত এবং অন্তর থেকে তার অস্বীকৃতি।"

নবী করীম (স) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমাদের এই দীনে যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন, "কেউ যদি এমন কাজ করে যা আমাদের এই শরীআতে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"

তিনি অন্য এক হাদীসে ঘোষণা করেছেন- "তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! দীনে নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদ্আত এবং প্রত্যেক বিদ্আতই পথভ্রষ্টতা।"

এ সকল হাদীসে বিদ্আত প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং উম্মতকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। আর এতে লিপ্ত হওয়া থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে :

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"(সূরা আল-মায়িদা : ৩)

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের জন্য আল্লাহ দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন। মহানবী (স) পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন, তার পরে লোকেরা কথায় ও কাজে যেসব নব প্রথার উদ্ভাবন করে শরীআতের সাথে সম্পৃক্ত করবে সে সব বিদ্আত বিধায় প্রত্যাখ্যাত হবে।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ বিদ্আত থেকে জনগণকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কেননা এটা দ্বীনে অতিরিক্ত সংযোজন যার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা কাউকে দেননি এবং আল্লাহর শত্রু ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান কর্তৃক তাদের ধর্মে নব নব প্রথা সংযোজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্বরূপ। এরূপ করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামকে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার সুযোগ প্রদান করা। এটা যে কতো বড় জঘন্য কাজ এবং আল্লাহর বাণীর বিরোধিতা তা চিন্তা করে সকলকে বিদ্আত থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. তাওহীদ কত প্রকার?
   ক) তিন প্রকার;
   খ) এক প্রকার;
   গ) চার প্রকার;
   ঘ) পাঁচ প্রকার।

২. তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান-
   ক) ওয়াজিব;
   খ) সুন্নাত;
   গ) ফরয;
   ঘ) ফরযে কিফায়াহ।

৩. বিদ্‌আত হল এমন কাজ যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই-এটি কার অভিমত?
   ক) হযরত ওমর (রা);
   খ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা);
   গ) ইমাম আবু হানীফা (র);
   ঘ) ইমাম নববী (র)।

৪. বিদ্‌আত বলা হয়-
   ক) ফরযের পরিপন্থী কাজকে;
   খ) সুন্নাতের পরিপন্থী কাজকে;
   গ) ফরয ও সুন্নাতের পরিপন্থী কাজকে;
   ঘ) শরীআতে সৃষ্ট নতুন কোন কাজকে।

৫. হারাম বিদ্‌আত কোনটি?
   ক) কবরমুখী হয়ে নামায আদায় করা;
   খ) মসজিদে বাতি জ্বালানো;
   গ) জুমআর নামাযের পর যোহরের নামায আদায় করা;
   ঘ) উপরের কোন উত্তর সঠিক নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদ কী? বুঝিয়ে লিখুন এবং তাওহীদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. বিদ্‌আত বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
৩. বিদ্‌আত-এর একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করুন।
৪. বিদ্‌আত কত প্রকার ও কী কী? লিখুন।
৫. বিদ্‌আত নিন্দনীয় হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপন করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. বিদ্‌আত বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ বিদ্‌আতের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
২. ব্যাখ্যা করুন, 'বিদ্‌আত ধর্মের নামে একটি জঘন্য প্রথা।'